শেখ জেবুল আমিন দুলাল

চেতনার বালাকোট

খোলাফায়ে রাশেদার প্রদীপ্ত পথ ধরে
যুগে যুগে আমরাই জেগেছি,
বুকে নিয়ে কুরআনের বিপ্লবী পয়গাম
বারে বারে দেশে দেশে লড়েছি
সত্যের সংগ্রাম করেছি।।

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের জান ও মাল
জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন।
তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে মারে
এবং নিজেরাও নিহত হয়।

-সূরা আত তাওবা ঃ ১১১

প্রারম্ভিক কথা

হিমালয়ান উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের বলিষ্ঠ এবং সংগ্রামী ভূমিকা ইতিহাসে প্রজ্জ্বল শিখার ন্যায় দীপ্তিমান। বৃটিশ বিতাড়নের আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য বৈজ্ঞানিক কর্মসূচী সম্বলিত সংগঠন ও আধুনিক কলা-কৌশল প্রয়োগে মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রজ্ঞা আজও সকলকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দেয়। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক ও সশস্ত্র সংগ্রামের পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ সমাজ-বিপ্লবের উদ্দেশ্যে ইসলামী আন্দোলন গড়ে তোলার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও তাঁরা অনাগত ভবিষ্যতের জন্য রেখে গেছেন।

এই অঞ্চলের মুসলিম মিল্লাতের ঈমানী প্রাণ-প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর র. রেখে যাওয়া কর্মসূচী অনুকরণ করেই হযরত সৈয়দ আহ্মদ ব্রেলভী ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা পরবর্তী সময়ে এক ইসলামী আন্দোলন পরিচালিত করেছিলেন। সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব, প্রখর দূরদৃষ্টি, তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দ্বারা হযরত সৈয়দ ব্রেলভী উপমহাদেশে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা কিনা উপমহাদেশের বৃটিশ বিরোধী রাজনৈতিক এবং ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়ের সূচনা করেছে। শহীদ সৈয়দ আহ্মদ ব্রেলভী তাঁর বাস্তব সাংগঠনিক কাঠামো ও কর্মসূচী, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীবাহিনী এবং রণচাতুর্যের মাধ্যমে যে বিপ্লবের জোয়ার এনেছিলেন, তা ছিল আধুনিক সমাজ বিপ্লবেরই এক নবতর প্রক্রিয়া। সে বিপ্লব তদানিন্তন সাম্রাজ্যবাদী বেনিয়াদের সাধের মসনদ-ভীত যেমনিভাবে প্রকম্পিত করে তুলেছিল তেমনিভাবে আজকের আধুনিক প্রযুক্তির যুগেও তার কর্মকৌশল এবং

লৌকিক দৃষ্টিকোণ এখানকার ইসলামী আন্দোলনের যে কোন কাফেলার জন্য হতে পারে অনুপ্রেরণার এক সাবলীল উৎসধারা।

একটি স্বাধীন, সার্বভৌম, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী যে সব কর্মসূচী ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস হচেছ এই পুস্তিকাখানি। মুসলিম পতনযুগের পর সীমাহীন প্রতিকূলতার রক্তপাথার পাড়ি দিয়ে উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের ধারবাহিকতা সম্পর্কে আজকের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সম্যক ধারণা দেয়ার জন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে সর্বপ্রথম এই পুস্তিকাখানি প্রকাশিত হয়েছিল। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে এর সমস্ত কপি শেষ হয়ে যায়। ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আজকের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে 'প্রফেসরস পাবলিকেশনস' পুস্তিকাটি পুণঃ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের অনেক ভূল-ভ্রান্তি এ সংস্করণে সংশোধন করা হয়েছে। এর পরও যে কোন সংশোধন প্রয়াসকে স্বাগত জানাবো ইন্‌শাআল্লাহ।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ইসলামী আন্দোলনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কল্যাণে আসলেও আমার শ্রম সার্থক মনে করবো। আল্লাহ আমার এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন।

নিবেদক
শেখ জেবুল আমিন দুলাল
অক্টোবর, ২০০৩

প্রকাশকের আরজ

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের, যার অশেষ রহমতে আমরা উপমহাদেশে মুসলিম ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উপর লিখিত এ বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে সক্ষম হলাম।

হাজার বছরের মুসলিম শাসনের পর এক প্রকার দুঃস্বপ্নের মত উপমহাদেশে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার কারণে মূলত মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্থ হয় সবচেয়ে বেশী। কিন্তু ওলামা-ই-কেরামরা ইংরেজ শাসনকে মেনে নেননি কখনও। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত দীর্ঘ এক'শ বছরব্যাপী উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে মুসলমানগণ আলিমদের নেতৃত্বে ব্যাপক ইংরেজ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করেন।

এ সকল আন্দোলনের মধ্যে হযরত সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর নেতৃত্বাধীন মুজাহিদ আন্দোলন ছিল সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য সশস্ত্র আন্দোলন। ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল দ্বীনি ভাবধারার উজ্জীবন ও সম্প্রসারণ এবং বিধর্মী শাসনের গোলামী থেকে মুক্তি লাভ। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভূত্বকে খতম করে এক আল্লাহ্‌র প্রভূত্ব কায়েম করা। এই আন্দোলন কিছু দিনের জন্য হলেও উনবিংশ শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্নে প্রকৃত খেলাফত "আলা মিনহাজিন্নাবুয়াত" নবীর তরীকা মোতাবেক খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিল।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই পুস্তকখানা পড়ে বর্তমান ইসলামী আন্দোলনের ভাই ও বোনেরা সেই সব মর্দে মুজাহিদদের আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জানতে পারবেন। আমি আশা করি এই পুস্তক পড়ে আমরা ইসলামী আন্দোলনকে আরো দ্রুত এগিয়ে নিতে উজ্জীবিত হবো।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে তার দ্বীনের জন্য কবুল করুন।

আমিন।

চেতনার বালাকোট

চেতনার বালাকোট

ইংরেজবিরোধী মনোভাব

বার্মাসহ সমগ্র হিমালয়ান উপমহাদেশব্যাপী বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। এশিয়া মহাদেশের এত বিরাট এলাকা এর আগে কখনো একক শাসনাধীনে আসেনি। হিন্দু ও মুসলমান এ দুটো জাতিই তখন এ অঞ্চলের প্রধান অধিবাসী ছিল। হিন্দু ছিল শতকরা সত্তর জন, আর মুসলমান ছিল শতকরা ত্রিশ জন। সংখ্যালঘু হলেও মাত্র কয়েক বছর পূর্বে তারা এদেশের শাসনকর্তা ছিল-এমন একটা বোধ বা অনুভূতি মুসলমানদের হৃদয়ে জাগ্রত ছিল। অন্যদিকে হিন্দুরা মুসলমানদিগকে অস্পৃশ্য এবং বিদেশী মনে করতো।

এ উপমহাদেশের প্রকৃত অধিবাসী যে কারা, এ তথ্য খুঁজে বের করতে গিয়ে কয়েকটি মজার ব্যাপার প্রকাশ পেয়েছে। এখানকার অনার্য অধিবাসীরা আর্যদেরকে অনুপ্রবেশকারী বলে মনে করেছে। আর্য-অনার্য অমুসলিমরা ইরান-তুরানের মুসলমানদের বহিরাগত ভেবেছে। মুসলমান পাঠানরা মুসলমান মুগলদেরকে ভীনদেশী হিসেবে চিনেছে। আবার বৃটিশ আধিপত্যের সময় হিমালয়ান উপমহাদেশের অধিবাসী-কি মুসলমান, কি হিন্দু-সকলে একযোগে ইউরোপীয় খৃষ্টানদেরকে অন্যায় জবরদখলকারী বলে চিহ্নিত করেছে।

উপমহাদেশের প্রকৃত অধিবাসী যে কারা (যারা সরাসরি আকাশ থেকে এসে এ এলাকায় নেমেছে) সেকথা জানা সত্যিই দুঃসাধ্য ব্যাপার।

লিখছিলাম ভিন্ন একটা প্রসঙ্গ। হিন্দুদের দৃষ্টিতে বহিরাগত মুসলমানদের পরিবর্তে জবরদখলকারী খৃস্টানদের শাসনে খুব একটা পার্থক্য ছিলনা। স্থানীয় হিন্দুরা উপমহাদেশের খৃস্টান শাসনকে সহজভাবে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু বৃটিশরা মুসলমানদের Attitude ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিল যে তারা এত সহজে বৃটিশ শাসন মেনে নেবার পাত্র নয়। মুসলমানদের অসহযোগী মনোভাব আর হিন্দুদের অনুগত সমর্থন-এ-দুই নিয়েই শুরু হলো বৃটিশ শাসন। মুসলমানরা এ পরিবেশকে "দারুল হর্‌ব" বা শত্রু কবলিত এলাকা বলে ঘোষণা করলো। ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী "দারুল হর্‌ব" এমন এলাকাকে বুঝায়, যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া অথবা সেখান থেকে হিজরত করা মুসলমানদের জন্য ফরজ-অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। বিদেশী বেনিয়াদের সাথে ষড়যন্ত্র করে অনুগত হিন্দুরা মুসলমানদেরকে শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকেই বিচ্যুত করেনি, বরং তাদেরকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকেও চরম দেউলিয়াপনার দিকে ঠেলে দিয়েছে। যে উপমহাদেশটি এতদিন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে "দারুল ইসলাম" বা "মুসলিম রাষ্ট্র" হিসেবে পরিচিত ছিল, ভাগ্যের নির্মম পরিণতিতে আজ তা মুসলমানদের উপর জুলুম-অত্যাচার আর নিপীড়নের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছে।

হিমালয়ান উপমহাদেশ "দারুল হরব"-এ উপলব্ধির ফলেই এ অঞ্চলের মুসলমানেরা ইংরেজ শক্তির উপর বার বার বিক্ষোভে ফেটে

পড়েছে। সতেরশ সাতান্নর পর থেকে শুরু করে পুরো একশতকেরও অধিককাল মুসলমানেরা দেশটিকে প্রজ্বলিত রেখেছিল বিদ্রোহের অনলে, এবং এরই চরম বিস্ফোরিত রূপ দেখা দিয়েছিল আঠারশত সাতান্ন'র সারাদেশব্যাপী গণ আন্দোলনে, এর পরে ছিল আঠারশত চৌষট্টির সীমান্ত অভিযান। সতেরশত পঁয়ষট্টির ফকির বিদ্রোহ দিয়ে এ সংগ্রাম অধ্যায়ের সূচনা। মাঝখানে তিতুমীরের বিদ্রোহ, হাজী শরীয়তুল্লাহ ও দুদুমিয়ার আন্দোলন, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর অভ্যুদয় ও বালাকোটের যুদ্ধ, পাটনায় শাহ্ এনায়েত আলীর সংগঠন ও তার তৎপরতা, সিত্থানা, মূল্কা ও পাঞ্জাবের যুদ্ধসমূহ প্রভৃতির মাধ্যমে এর বিস্তৃতি এবং আঠারশত চৌষট্টির সীমান্ত অভিযান ও সর্বশেষ পাটনা, অম্বলার ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে সে সশস্ত্র সংগ্রাম অধ্যায়ের ঘটে পরিসমাপ্তি।

একদিকে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অবসান, অপরদিকে বর্বর মারাঠাদের উপর্যুপরি আক্রমণ, পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের বিজয়, পাঞ্জাবে শিখদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাশ, এসব পরিবেশ পরিস্থিতির সমন্বয়ে উপমহাদেশের অধিবাসীদের ঘাড়ে তাদের ভাগ্য নিয়ন্তা হিসেবে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসলো ইংরেজ আধিপত্যবাদ। নিজেদের চরম অবহেলার ফলে সবকিছু হারিয়ে ফেলার পর মুসলমানরা তাদের শেষ সম্বল "ঈমান" টুকু হারাতে রাজী হলনা। চারিদিকের প্রতিবন্ধকতা আর চাপের মুখে এবং অনুশোচণার তীব্র কষাঘাতে তাদের মধ্যে ঈমানী চেতনার বাণ ডাকলো। ঐক্য আর ঈমানী চেতনায় বলীয়ান হয়ে পুনরায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপমহাদেশকে দারুল্ ইসলামে রূপান্তরিত করার জীবন-মরণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হলো মজলুম মুসলমানরা।

আন্দোলন ও তার দৃষ্টিভঙ্গী

মুসলমানদের অসহযোগিতা এবং বিদ্রোহী মনোভাব ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে হিন্দুদের সহায়তায় তাদের উপর বৃটিশ নিপীড়নও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঐতিহ্যগতভাবে মুসলমানরা কোন সময় জুলুম-নিপীড়নের সামনে মাথা নত করেনা। উপমহাদেশেও এই ঐতিহ্যের পূনঃপ্রদর্শন শুরু হলো। বিদ্রোহের দাবানল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দেশে প্রতিকুল পরিবেশ থাকায় কৌশলগত কারণে সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে অগ্রসর না হয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। প্রথম থেকেই আন্দোলনের ব্যাপারে তাদের একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তা হচ্ছে এই যে, ইসলামের সত্যিকার আদর্শ থেকে বিচ্যুতিই হচ্ছে মুসলমানদের পতনের মূল কারণ। তাই কুরআন ও হাদীসের প্রতি কঠোর আনুগত্যকে ভিত্তি করেই তৎকালীন মুসলমানদের সংগঠনগুলো গড়ে উঠেছিল। এ ধরণের একটি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শহীদ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী রহ্‌মতুল্লাহ্‌।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর মোতাবেক ১২০১ হিজরীর ৬ই সফর অযোধ্যার রায়বেরেলীর এক সৈয়দ পরিবারে সৈয়দ আহমদ জন্ম গ্রহণ করেন। বংশ পরিচয়ের দিক থেকে সৈয়দ আহমদের পিতা ছিলেন মুহাম্মদ ইরফান, তাঁর পিতা মুহাম্মদ নুর, তাঁর পিতা সৈয়দ মুহাম্মদ হুদা, তাঁর পিতা সৈয়দ ইলমুল্লাহ, তাঁর পিতা সৈয়দ মুহাম্মদ ফাজায়েল, তাঁর পিতা সৈয়দ মুহাম্মদ মুয়াজ্জম, তাঁর পিতা সৈয়দ

আলাউদ্দীন, তাঁর পিতা কুতুবুদ্দীন সানী, তাঁর পিতা সদরুদ্দীন সানী, তাঁর পিতা সৈয়দ আহমদ, তাঁর পিতা সৈয়দ আলী, তাঁর পিতা সৈয়দ কেওয়ামুদ্দীন, তাঁর পিতা সদরুদ্দীন, তাঁর পিতা কাজী রুকনুদ্দীন, তাঁর পিতা মীর নিযামুদ্দীন, তার পিতা মীর কুতুবুদ্দীন, তাঁর পিতা সৈয়দ রশীদুদ্দীন, তাঁর পিতা হাসান, তাঁর পিতা ইউসুফ, তাঁর পিতা ঈসা, তাঁর পিতা হাসান, তাঁর পিতা আবু জাফর, তাঁর পিতা কাশেম, তাঁর পিতা আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, তাঁর পিতা হাসান আল আজারুল জাওয়াদ, তাঁর পিতা মুহাম্মদ সানি, তাঁর পিতা আবু মুহাম্মদ, তাঁর পিতা মুহাম্মদ আল মেহদী নাফসে জাকিয়া, তাঁর পিতা আবদুল্লাহ আল মাহাজ, তাঁর পিতা হাসান মুসান্না, তাঁর পিতা হযরত ঈমাম হাসান রা., তাঁর পিতা হযরত আলী রা.।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

বংশের নিয়ম অনুযায়ী সৈয়দ আহমদের চার বছর, চারমাস, চারদিন, বয়স হলে তাঁকে মক্তবে পাঠানো হয়। তাঁকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হয়নি। কিন্তু লেখাপড়ায় তাঁর তেমন উৎসাহ ছিলনা। তিন বৎসরকাল মক্তবে যাতায়াত করে তিনি পবিত্র কোরআনের মাত্র কয়েকটি সূরা কণ্ঠস্থ এবং কয়েকটি আরবী বাক্য লেখা ছাড়া আর কিছুই শিখতে পারেননি। তিনি কি কারণে লেখাপড়ায় নিরুৎসাহী ছিলেন, তা জানা সম্ভব হয়নি। তবে তিনি ফরাসী ভাষায় বেশ পারদর্শী ছিলেন। ধরাবাঁধা লেখাপড়া যদিও তিনি করেননি, কিন্তু শরীয়াতের মৌলিক এবং খুঁটিনাটি বিধি-নিষেধগুলি ভালোভাবেই জানতেন। অনায়াসে তিনি

আরবী, ফরাসী বুঝতেন এবং কুরআন-হাদীসের সুন্দর ও আকর্ষণীয় ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে পটু ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি খেলা-ধূলার প্রতি অধিক আগ্রহী ছিলেন। সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে দু'টি দলে ভাগ করে একদলের দুর্গে আরেক দলের আক্রমণ চলতো, পাড়ার সমবয়স্ক বালকদের নিয়ে ইসলামী বাহিনী গঠন করে জিহাদের ময়দানের ন্যায় উচচস্বরে তাকবীর ধ্বনী তুলে মনগড়া কাফির সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

সৈয়দ সাহেব নিজেই বলেছেন, "শৈশব থেকেই আমি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতাম যে, আমি কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবো। মাঝে মাঝেই আমার কথা-বার্তা, চাল-চলনে এই মনোভাব প্রকাশ পেয়ে গেলে মুরব্বীগণ এটাকে বালকসূলভ কল্পনা-বিলাস বলে উড়িয়ে দিতেন। শুধুমাত্র আমার মা কথাগুলো মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। শৈশব থেকেই সৈয়দ আহমদ লেখাপড়ার চেয়ে জিহাদ এবং সৈনিক জীবনের প্রতি বেশী আসক্ত ছিলেন। তিনি নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা চালাতেন। এক বর্ণনামতে সৈয়দ আহমদ কিশোর ভাগনেকে পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে প্রতিদিন পাঁচশতাধিক বার ডন করতেন। আল্লাহ তার শরীরে শক্তিও দিয়েছিলেন প্রচুর। সৈয়দ সাহেব সাঁতারেও ছিলেন সুদক্ষ। প্রবল স্রোতের প্রতিকুলে তিনি অনায়াসে সাঁতার কেটে যেতেন। ডুব দিয়ে তিনি এত দীর্ঘ সময় পানির নীচে থাকতে পারতেন যে, সে সময়ের মধ্যে সহজভাবে দু'রাকাত নামাজ আদায় করা যায়।

সৈয়দ সাহেবের মা খুব সাহসী মহিলা ছিলেন। পুত্রকে ইসলামী আদর্শের সৈনিক রূপে গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট অবদান

ছিল। আমাদের মায়েদের মত তিনি পুত্রকে ঘরের মধ্যে আঁকড়ে ধরে থাকতেন না, বরং সৈয়দ সাহেবের কাজ-কর্মে তার মা উৎসাহ দিতেন। একবার রায়বেরেলীতে ভয়াবহ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বেঁধেছিল। মুসলমানগণ হিন্দুদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে রওয়ানা হলেন। সৈয়দ সাহেব খবর পেয়ে বাড়ি থেকে তলোয়ার নিয়ে মায়ের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর মা তখন নামাজ আদায় করছিলেন। সৈয়দ সাহেবের পালক মা যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধ করলেন। কিন্তু নামাজ শেষ করে সৈয়দ সাহেবের আপন মা পুরো পরিস্থিতি শুনে সৈয়দ সাহেবের পালক মাকে বললেন, "বোন! নিঃসন্দেহে তুমি আহমদকে স্নেহ কর, কিন্তু সেই স্নেহ আমার স্নেহের সমান নয়! আমার হক তোমার হকের চেয়ে বেশী। আহমদকে যেতে দাও।" এরপর পুত্রকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বাবা যাও! শীঘ্র যাও! আর শোন কখনো পশ্চাদনুসরণ করবেনা। যদি কর, তবে জীবনে আর তোমার মুখ দেখবোনা।" সৈয়দ সাহেব চলে গেলেন। কিন্তু যুদ্ধ বাঁধার পূর্বেই সন্ধি হয়ে গেল। এখান থেকেই বোঝা যায় যে, সৈয়দ সাহেবের মা কিভাবে তাকে প্রতিপালন করছিলেন এবং কি ধরণের শিক্ষা দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে মা ছেলেকে ইসলামী আন্দোলনে ভবিষ্যত নেতা হিসেবে গড়ে তোলেন।

ঔষধের ব্যবহার সৈয়দ সাহেব খুব একটা পছন্দ করতেননা। একবার নাসিরাবাদের এক বাড়ীতে খাওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে কলিজা-কারী খেয়ে অসুস্থতা বোধ করলেন এবং সাথীর কাছে অসুবিধার কথা জানালে সাথী তাঁকে হজমীর ঔষধ দিলেন। সৈয়দ সাহেব ঔষধ সেবন না করে নিজের জামা সাথীর হাতে দিলেন এবং

দৌড়াতে লাগলেন। বহুদূর পর্যন্ত দৌড়ানোর পর একটি ছায়াযুক্ত গাছের নীচে চাদর বিছিয়ে শুয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে বললেন, "সব ঠিক হয়ে গেছে।" জ্ঞান বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই সৈয়দ আহমদ মানুষের সেবা করাকে নিজের কর্তব্য বলে ধরে নিয়েছেন। অক্ষম, বৃদ্ধ, এতিমদের প্রতি সবসময় তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। প্রায়শঃই তিনি সঙ্গী-সাথীদের নিকট ইয়াতীম-মিসকিনদের সাহায্য করার গুরুত্ব এবং উপকারিতা বর্ণনা করতেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামী জ্ঞানার্জনের জন্য সৈয়দ সাহেব দিল্লীর বিখ্যাত আলেম শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলবী সাহেবের নিকট আসেন। আলাপ-পরিচয়ের পর জানা গেল যে, সৈয়দ আহ্মদের নানা এবং চাচা শাহ সাহবের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এই সূত্রে সৈয়দ সাহেব শাহ্ সাহেবের নিকট বেশ সমাদৃত হলেন। শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞানার্জনের জন্য এত দীর্ঘ সফর করে দিল্লী পর্যন্ত আসায় শাহ্ সাহেব সৈয়দ আহ্মদের উপর আরো বেশী সন্তুষ্ট হলেন। এরপর একজন খাদেমের মাধ্যমে শাহ্ সাহেব তাঁর ভাই মৌলভী আবদুল কাদের সাহেব আকবরাবাদী মসজিদ নামক একটি মসজিদে ইসলামী জ্ঞানের ক্লাশ নিতেন।

এই আকবরাবাদী মসজিদকে কেন্দ্র করে তাঁর দিল্লীর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। প্রথমাবস্থায় তিনি এই মসজিদেই অবস্থান করেন। জিহাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা এই মসজিদে বসেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিকগণের ধারণা, সৈয়দ আহমদ ও তাঁর আরো কয়েকজন শিক্ষার্থী সাথীর যে দলটি এখানে ইসলামী জ্ঞানার্জন করেছিল, এর বহু পূর্ব থেকেই সম্ভবতঃ ইসলামী জ্ঞানার্জনের জন্য আরো অনেকগুলো দল এই মসজিদে এসেছে। দুঃখজনক হলেও সত্য

যে, এই ঐতিহাসিক গুত্বপূর্ণ মসজিদটি এখন আর নেই। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী "ইয়ালুন্নিসা" এই মসজিদটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। আকবরাবাদী ছিল বেগমের একটা উপাধী। তাই মসজিদটিও "আকবরাবাদী" নামে পরিচিতি ছিল। মসজিদের মূল ভূমির উপর বর্তমান এড্ওয়ার্ড পার্ক অবস্থিত। এখানে সৈয়দ আহ্মদ তিন বছর শিক্ষা গ্রহণ করেন। শুধুমাত্র পড়ার সময় তিনি চোখে দেখতেন না, কিন্তু অন্য কোন সময় চোখে তার কোন অসুবিধা হতোনা। শিক্ষা জীবনে এটা ছিল তাঁর বিরাট অন্তরায়। এই অসুবিধার পরও তিনি ইতোমধ্যে মিশ্কাত শরীফসহ আরো বহু গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন উপায়ে জ্ঞানার্জন করেন। প্রচলিত ধরা-বাঁধা শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অন্যমনস্ক। এ ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত ছিল। "বিরাট বিরাট গ্রন্থ পাঠ করা আলেম হওয়ার শর্ত নয়, বরং এ কথা জানতে হবে যে, কোন কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং কোন কাজে তার অসন্তুষ্টি। হযরত আবু বকর রা. এবং হযরত ওমর রা. কখনো 'শরহে বেকায়া' কিংবা 'হেদায়া' কিতাব পাঠ করেননি। কিন্তু উল্লেখিত গ্রন্থের গ্রন্থকারগণ তাদেরকে নেতা মানতেন এবং সাহাবাদের কার্যাবলীকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সৈয়দ আহ্মদ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির মাপকাঠিতে নিজের জীবন গড়ে তুলেছিলেন। শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই জিহাদ করেন এবং শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই শাহাদাত বরণ করেন।

তৎকালীন উপমহাদেশীয় মুসলমানদের জীবনে যে সমস্ত অনাচার বা বেদায়াত ঢুকে পড়েছিল, সেগুলো সংস্কারের ব্যাপারে তার আগ্রহ শিক্ষা গ্রহণকালীন সময় থেকেই ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষ করে তৎকালীন হিন্দু সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের প্রভাবে মুসলিম

জাতি দুর্বলচেতা, কাপুরুষ ও পঙ্গু হয়ে পড়ার কারণে তিনি আরো বেশী ব্যতিব্যাস্ত হয়ে পড়েন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহ্মদ শাহ্ আব্দুল আজিজ দেহলবীর হাতে 'বাইয়াত' গ্রহণ করেন। শাহ্ সাহেব সৈয়দ আহ্মদকে দোয়া করলেন, "আল্লাহ তোমাকে 'বেলায়েতে আম্বিয়া' এবং 'বেলায়েতে আওলিয়া' দান করুন।" সৈয়দ আহ্মদ 'বেলায়েতে আম্বিয়া' এবং 'বেলায়েতে আওলিয়া' সম্পর্কে জানতে চাইলেন। শাহ সাহেব বললেন, 'বেলায়েতে আম্বিয়া' মানে নবীদের দায়িত্ব, কর্তব্য, ও বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নির্ভিক, প্রয়োজনবোধে শত্রুর মোকাবিলায় জান-মাল কোরবান করার জন্য প্রস্তুত থাকা, দাওয়াতে দ্বীনের জন্য যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করা এবং সে উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করা। এটাকে বলা হয়, 'কুর্‌ব বিল ফারায়েজ' অর্থাৎ ফরজ আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ। 'বেলায়েতে আওলিয়া' মানে রাত দিন নামাজ, রোজা, জিকির, নফল এবাদত ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকা। লোকালয় ত্যাগ করে নির্জনে আল্লাহর স্মরণে সময় অতিবাহিত করা, শুধুমাত্র নিজেকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছানোর জন্য নফল এবাদতে মশগুল থাকা। এটাকে বলা হয় 'কুর্‌ব বিন নাওয়াফেল'। অর্থাৎ নফল এবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ।

১২২২ হিজরীর শেষ অথবা ১২২৩ হিজরীর প্রথম দিকে সৈয়দ আহ্মদ দিল্লী থেকে রায়বেরেলী ফিরে এলে আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে বিয়ে করিয়ে দেন। সকলের ধারণা ছিল যে, হয়তো এবার সৈয়দ আহ্মদ সংসারের কাজ কর্মের প্রতি মনোযোগী হবেন। নাসিরাবাদের বিবি জোহ্রার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। ১২২৪ হিজরীতে "সারা" নামের তাঁর এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। নিজ বাড়ীতে গেলে সৈয়দ সাহেবের একটা বিশেষ কর্মসূচী ছিল। পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহে দাওয়াতী সফর,

পারিরারিক, বংশীয় এবং গ্রামের বিভিন্ন ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করে পরস্পরের মধ্যে সখ্যতা স্থাপন, অনৈসলামিক এবং বেদআ'তী কাজসমূহ দূরীকরণের প্রচেষ্টা, বন্ধু-বান্ধব এবং ভক্তদিগকে জিহাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করা, নিজে ব্যক্তিগতভাবে ধর্মীয় কাজগুলোকে বিশেষ যত্ন সহকারে পরিপূর্ণ করা, ইত্যাদি ছিল তাঁর বাড়ি অবস্থানকালীন কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত। ২৩ অথবা ২৪ বৎসর বয়সে সৈয়দ আহ্মদ দ্বীনের খেদমত করার উদ্দেশ্যে নওয়াব আমীর খান পিন্ডারীর সেনাবাহিনীতে অশ্বারোহী হিসেবে চাকুরী গ্রহণ করেন। এখানেই তিনি শারীরিক প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র চালনায় পারদর্শিতা অর্জন করেন।

তৎকালীন উপমহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা

তৎকালীন উপমহাদেশের মুসলমানগণ সত্যের পথ থেকে বহু দূরে সরে যায়। কুকর্ম আর অসত্যের পথে তারা বিরামহীন ভাবে ছুটে চলে। আরাম-আয়েশ এবং হীন মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার উপকরণ সংগ্রহ করা ব্যতীত আমীর ওমরাহ্দের আর কোন কাজ ছিল না। এর পরিনাম সম্পর্কে তারা ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। মোগল শক্তি তখন প্রায় বিধ্বস্ত। আড়াইশত বছরের আপ্রাণ চেষ্টা সাধনার পর একটুকরা একটুকরা করে মোগলরা যে বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেছিল, কাবুল থেকে আসাম, আরাকান এবং কারাকোরাম থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত এই পুরো অঞ্চলে মোগলদের বিজয় পতাকা উড্ডীন ছিল। ভোগ বিলাস, গৃহবিবাদ, এবং অরাজকতার মাধ্যমে এক একটি রাজ্য কেন্দ্র থেকে বিচিছন্ন হয়ে যাচিছল। এর মধ্যে যে কয়জন সচেতন তাজা প্রাণ এই নিরাশার অন্ধকারকে দুর করে আশার আলো জ্বালাবার আপ্রাণ

চেষ্টা করেছিলেন -হায়দার আলী এবং টিপু সুলতান ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। মহীসুরের হায়দার আলী যে নতুন শক্তির পত্তন করলেন টিপু সুলতান তার শিরায় শিরায় ইসলামের তাজা রক্ত প্রবাহিত করেন। কিন্তু বিরোধ এবং স্বার্থপরতার এত উপকরণ সঞ্চিত হয়েছিল যে, এই মুজাহিদদ্বয়ের প্রাণপণ চেষ্টা ও সফলতার মুখ দেখেনি। শুধুমাত্র ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য উৎসাহে উদ্দীপনা এবং উৎসর্গের দু'টি প্রদীপ শিখা হিসেবে তাঁদের কর্মতৎপরতা ইতিহাসে স্থান লাভ করলো। নিজেদের দুর্বলতার কারণে সে শক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

এই সময় মোগল সাম্রাজ্যের এক বিরাট অংশে মারাঠাগণ হাঁটু গেড়ে বসে। একবার মোগল সিংহাসনই প্রায় তাদের দখলে চলে গিয়েছিল। পানি পথের যুদ্ধে আহ্মদ শাহ্ আব্দালী মারাঠাদের উপর চরম আঘাত হানেন। এরপর যদিও মারাঠাগণ ৪০/৫০ বছর টিকে ছিল, কিন্তু পূর্বাবস্থা আর ফিরে পায়নি এবং ক্রমে ক্রমে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। পাঞ্জাবে রনজিৎ সিং শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যমে তথাকথিত একটি রাষ্ট্রের নামে ত্রাস সৃষ্টিকারী এক বাহিনী গঠন করে। রনজিৎ সিং-এর মৃত্যুর চার পাঁচ বছরের মধ্যে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সিন্ধুর শাসন ক্ষমতা চার জন আমীরের অধীনে ছিল। অযোধ্যায় শুজাউদ্দৌলা, দাক্ষিণাত্যে নিযাম, এবং বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় নবাব আলীবর্দী খান। এদের ধারণা ছিল, সম্পূর্ণ উপমহাদেশ মুসলমানদের অধীনে না থাকলেও অন্ততঃপক্ষে নিজেদের এলাকাগুলো থাকলেই যথেষ্ট। পরবর্তী সময়ে সায়াদাত আলী খান লোভের বশবর্তী হয়ে অযোধ্যার অধিকাংশই ছেড়ে দিলেন। বাকী অংশও পরে তাঁর বংশধরদের হস্তচ্যুত

হয়ে যায়। অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং অরাজকতার দরুন ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে দাক্ষিণাত্যের সীমানাও প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়। নবাব আলীবর্দী খাঁন ইন্তেকালের এক বছরের মধ্যেই বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা ইংরেজদের হাতে চলে গেল। উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তিপ্রস্তর এখানেই স্থাপিত হলো। পরে ইংরেজগণ মারাঠা এবং নিযামের সাথে মিলিতভাবে মহিশুরের পতন ঘটালো। একাজ শেষ করে অল্প দিনের মধ্যেই মারাঠা, নিযাম এবং অযোধ্যাকে সাহায্যকারী হিসেবে শৃংখলাবদ্ধ করে বাকী সকলকে পুতুলে পরিণত করে। এর পরপরই উপমহাদেশের কেন্দ্রস্থল দিল্লী হস্তগত করে ইংরেজগণ জেঁকে বসলো।

এই সময় উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য মাত্র তিনটি পথ খোলা ছিল। প্রথমতঃ সত্যের পথ ত্যাগ করে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলা। দ্বিতীয়তঃ সত্যের পথ পরিত্যাগ না করা এবং এ কারণে যত বিপদই আসুক না কেন ধৈর্যের সাথে তা সহ্য করে করে শেষ হয়ে যাওয়া। তৃতীয়তঃ অসত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। প্রথম পথ ছিল মৃত মুসলমানদের জন্য। দ্বিতীয় পথ ছিল মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকার আশায় তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া। তৃতীয় পথ হচেছ পৌরুষের পথ। সৈয়দ আহ্‌মদ বেরেলভী মুসলমানদের এই দুর্যোগের দিনে তৃতীয় পথটাই বেছে নিলেন। এই সময় আমীর খান পিন্ডারী কাগজ-পত্রে ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করলেও মনে প্রাণে স্বাধীন ছিলেন। তার অধীনে প্রায় চল্লিশ হাজার সিপাহী এবং একশত চল্লিশটি তোপ ছিল। এটা ছিল ইংরেজদের জন্য একটা ভয়ের কারণ। এই বিরাট শক্তিকে ইসলামী আন্দোলনের কাজে লাগানোর জন্যই অনেক ভেবে-চিন্তে সৈয়দ আহমদ আমীর খান পিন্ডারীর

সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। যতদিন পর্যন্ত আমীর খান পিন্ডারীর মন স্বাধীন ছিল, সৈয়দ আহ্‌মদ ততদিন পর্যন্ত তাঁর বাহিনীতে ছিলেন। সৈয়দ সাহেব আশা করেছিলেন, একদিন না একদিন সুযোগ আসবেই। কিন্তু আমীর খান যেদিন সত্যিকারভাবে ইংরেজদের সাথে হাত মিলালেন সৈয়দ সাহেব সেদিন থেকেই পৃথক হয়ে গেলেন। কেননা তিনি যে আশা নিয়ে এখানে এসেছিলেন, তা পূর্ণ হবার সুযোগ আর অবশিষ্ট রইলনা।

জীবনের মিশন

সৈয়দ আহ্‌মদের প্রধান কাজ ছিল আল্লাহর বান্দাহ্‌দেরকে তাওহীদের দিকে আহবান এবং তাদের চরিত্র সংশোধন করা। এটা ছিল জীবনের মিশন। তিনি যখন যেখানে যেতেন, শুধু এই কাজেই ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর এই বিরতিহীন কাজের ফলে তিনি যে সেনাবাহিনীতে ছিলেন, সম্পূর্ণ বাহিনীর চরিত্রই পরিবর্তীত হয়ে গেল। পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ছিলনা, সকলেই শরীয়তের অনুসরণ করতো, দাওয়াতে দ্বীন এবং সংশোধন করার সুযোগ পেলে সৈয়দ সাহেব তা কখনো হাতছাড়া করতেন না। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদেরকে মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলা। প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মত বর্তমান সময়ের মুসলমানদের মধ্যে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর উদ্দীপনা জাগ্রত করা এবং উপমহাদেশে বিশুদ্ধ ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা। তাঁর চরিত্রে খোদাভীতি এবং শরীয়তের কঠোর আনুগত্য থাকায় তাঁর নিকট দোয়ার জন্য বহু লোকের আগমন ঘটতো। চরিত্র সংশোধন এবং শরীয়তের আনুগত্যের স্বীকৃতি নিয়ে

তবে তিনি তাদের জন্য দোয়া করতেন। সৈয়দ আহমদের জীবনীতে এধরণের বহু ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। স্থানাভাবে এ পুস্তিকায় সে সব উদ্বৃতি দেয়া সম্ভব হলো না।

ত্বরীকায়ে মুহাম্মাদী সা. আন্দোলন

আমীর খান পিন্ডারীর বাহিনীতে যোগদানের পর প্রাথমিক পর্যায়ে কেউ তাঁকে চিনতো না, উন্নত ব্যক্তিত্ব এবং চারিত্রিক মাধূর্যের কারণে মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সকলের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধিমত্তার ফলে নবাব সাহেব তাঁকে খুব সম্মান করতেন। এমন কি প্রায় সব ব্যাপারেই সৈয়দ সাহেবের পরামর্শ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করতেন। সেনাবাহিনীতে চাকুরী করার পরও সৈয়দ সাহেব সুযোগ পেলেই নফল নামাজ পড়তেন। আশেপাশে দাওয়াতী কাজ করার মত লোক না পেলে তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে নিরিবিলি প্রভুর স্মরণে সময় অতিবাহিত করতেন। তিনি যখন কাপড় ধুতে যেতেন, বন্ধুদের ময়লা কাপড়ও ধোয়ার জন্য নিয়ে যেতেন। নবাব আমীর খান ইংরেজদের সাথে সন্ধি করতে চাইলে তাঁর মন্ত্রী পরিষদের প্রায় সকলেই ঐকমত্য প্রকাশ করলেন। কিন্তু সৈয়দ সাহেব এই সন্ধির প্রবল বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন, "ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরুন, আল্লাহ্র সাহায্য আসবে, জয়লাভ করলে গাজী হবো, মরলে শহীদ হবো। কোন মতেই তাদের সাথে সন্ধি করা ঠিক হবেনা। আর যদি আপনি ইংরেজদের সাথে সন্ধি করেন, তাহলে আমি আপনার সাথে থাকবোনা।" সন্ধির পর নবাব সাহেবের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও

সৈয়দ সাহেব তাঁর কয়েকজন সাথীসহ বাহিনী ত্যাগ করে জয়পুর চলে যান। কারণ যে ইংরেজ তাড়িয়ে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তিনি এই বাহিনীতে যোগদান করেছিলেন, সে উদ্দেশ্য যখন সাধিত হবার আশা আর নেই, তা হলে এখানে থেকে লাভ কি? অতঃপর দিল্লী গিয়ে শিক্ষাগুরু শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলবীর সাথে সাক্ষাৎ করে পুরো পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন এবং নিজেই সংস্কারের উদ্দেশ্যে কাজ শুরু করার সংকল্প ব্যক্ত করেন। শাহ্ সাহেব দোয়া করলেন। এবার সৈয়দ আহ্মদ মুসলিম সমাজ থেকে কুসংস্কার বিদূরীত করার কাজ শুরু করেন এবং এ উদ্দেশ্যে ব্যাপক কর্মী সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করেন।

সৈয়দ সাহেব তৎকালীন রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, যে ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে উপমহাদেশ অগ্রসর হচিছল, সর্বশক্তি দিয়ে এর প্রতিরোধ না করলে এ অঞ্চলে না থাকবে ইসলাম আর না থাকবে মুসলমান। এ ব্যাপারে তিনি কিছু উচচপদস্থ লোকজনের সাথে যোগাযোগ করেন। তৎকালীন উপমহাদেশে কাদেরিয়া, চিশতিয়া এবং নকশ্‌বন্দিয়া এই তিনটি বাইয়াত গ্রহণের ত্বরীকা প্রচলিত ছিল। সৈয়দ সাহেব এসব ত্বরীকা বাদ দিয়ে মুহাম্মদী ত্বরীকায় বাইয়াত গ্রহণ করাতেন। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, মুহাম্মদ সা. হলেন সবচেয়ে বড় পীর। তাঁর উপর কোন পীর নেই। তাঁর ত্বরীকা বাদ দিয়ে অন্য কারুর ত্বরীকা শ্রেষ্ঠ হতে পারেনা। জীবনের প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ সা.-এর ত্বরীকা বা পদ্ধতি অনুযায়ী সমাধা করা, যেমন শ্রম দেয়ার উদ্দেশ্য হচেছ নিজের ও পরিবারের ভরণ পোষণের

জন্য হালাল উপার্জন, রাতে ঘুমানোর উদ্দেশ্য শেষ রাতে জেগে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করা এবং ওয়াক্তের প্রথম দিকে ফজরের নামাজ আদায় করা, পানাহার করার উদ্দেশ্য হচেছ শরীর সুস্থ রেখে আল্লাহ্র আহ্কাম পালন করা, রোজা, নামাজ, হজ্জ্ব আদায় করা এবং প্রয়োজন বোধে জিহাদ করার শক্তি সঞ্চয় করা। মোটকথা জীবনের প্রতিটি কাজকর্ম, কথা-বার্তা, চলা-ফেরা, আদান-প্রদান, মুহাম্মদ সা. প্রদর্শিত পদ্ধতি বা ত্বরীকা অনুযায়ী শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হতে হবে। কুসংস্কারাচছন্ন মুসলিম সমাজকে হযরত মুহাম্মদ সা.-এর মূল শিক্ষার দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানাতেন বিধায় সৈয়দ সাহেবের নীতিসমূহ ত্বরীকায়ে মুহাম্মদী বা রসুল সা.-এর মৌলবাদ হিসেবে ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করে। সৈয়দ আহ্মদ কর্তৃক গৃহীত নীতিসমূহের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনের নাম পড়ে গেল "ত্বরীকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলন।"

সর্ব প্রথম সৈয়দ সাহেব উত্তর ভারতের রোহিলাদেরকে আন্দোলনের দাওয়াত দেন এবং তাদেরকে কর্মী হিসেবে গ্রহণ করেন। সেখান থেকে দিল্লী পৌঁছার কিছু দিন পর অর্থাৎ তাঁর সাংগঠনিক তৎপরতার প্রথম দিকেই কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তি এ আন্দোলনে শরীক হন এবং সৈয়দ আহ্মদের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে সর্ব প্রথম আনুগত্য গ্রহণ করেন শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহ্লবীর বড় ভাই শাহ্ আবদুল্লাহ্র পৌত্র মৌলবী ইউসুফ। তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সৈয়দ সাহেবের বন্ধু এবং নির্ভরযোগ্য পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেন। তৎকালীন বিখ্যাত আলেম মাওলানা আবদুল হাই এবং মাওলানা শাহ্ ইসমাঈল মৌলবী ইউসুফকে বলে দিলেন, "আপনি

প্রথমে সৈয়দ সাহেবের বাইয়াত গ্রহণ করুন। ফলাফল ভালো মনে করলে আমাদেরকে জানাবেন, আমরাও বাইয়াত গ্রহণ করবো।" পরে মৌলবী ইউসুফের কাছ থেকে বিস্তারিত জেনে তাঁরা উভয়েই সৈয়দ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং আজীবন তাঁর সাথী ছিলেন। এছাড়া মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ ইস্হাক, মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ ইয়াকুবও প্রায় একই সময়ে সৈয়দ সাহেবের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। এঁরা প্রায় সকলেই শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলবীর বংশধর ছিলেন। শাহ্ দেহলবী র. ছিলেন তৎকালীন উপমহাদেশের বিশিষ্ট মুসলিম নেতা। সৈয়দ সাহেবের সাথে দেহলবী বংশের নেতৃস্থানীয় লোকদের যোগদানের ফলে উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে গেল। দেহলবী বংশের প্রভাব ও ব্যক্তিত্বের কারণে অসংখ্য মুসলমান সৈয়দ আহ্মদের ত্বরীকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলনে যোগদান করেন। এতে করে ইসলামের একজন মহান শিক্ষক হিসেবে সৈয়দ আহ্মদ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

দাওয়াতে দ্বীন ও কর্মী সংগ্রহ অভিযান

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহ্মদ মাওলানা ইসমাইল ও মাওলানা আব্দুল হাইকে সাথে নিয়ে দিল্লী থেকে দাক্ষিণাত্যের নিযামের রাজ্য, পাটনা থেকে কোলকাতা ও বর্তমান বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত এবং বর্তমান পাকিস্তানের সীমান্ত হয়ে আফগানিস্তারের অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত দাওয়াতে দ্বীন বা ইসলামী আন্দোলনের আহ্বান এবং ব্যাপক কর্মী সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করেন। এই দাওয়াতি অভিযানের প্রথমে তিনি বেনারসের সেলুন সফরে যান। সেখানে একজন প্রভাবশালী

পীরের দরবারে নাচ-গান সহ কিছু বেদ'য়াতী অনুষ্ঠান হতো। সৈয়দ সাহেব খবর পেয়ে উক্ত পীরের সাথে দেখা করেন এবং তাঁকে কুরআন-হাদীসের দলীল দিয়ে বেদ'য়াতী কাজ বন্ধ করার পরামর্শ দিলে পীর সাহেব তা গ্রহণ করেন এবং তখন থেকে তাঁর দরবারে আর বেদ'য়াতী কোন অনুষ্ঠান হতোনা। উক্ত পীর সাহেবের নাম ছিল শাহ্ করীম আতা। সেলুন থেকে এলাহবাদ যাওয়ার পথে সৈয়দ সাহেব আহ্লাদগঞ্জ, মাঞ্ঝাপুর এবং কাড়া অঞ্চলে অবস্থান করেন। আহ্লাদগঞ্জের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব কাজী মির্জা কাজেম বেগ সহ বহু লোক সৈয়দ সাহেবের বাইয়াত গ্রহণ করেন। এলাহ্বাদে অনেক মুসলমান বাইয়াত গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে শায়খ গোলাম আলীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এরপর সৈয়দ সাহেব বেনারস সদরে পৌঁছেন। স্থানীয় শাহী মসজিদ বহুদিন ধরে অনাবাদী থাকায় সৈয়দ সাহেব তাঁর সাথীদের নিয়ে সেখানেই উঠেন এবং ধূলাবালী পরিস্কার করে নতুনভাবে মসজিদটি আবাদ করেন। বেনারসে মাসাধিককাল অবস্থানের সময় ১০/১৫ হাজার লোক সৈয়দ সাহেবের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। এ অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। যেমন স্থানীয় পীর সাহেবকে ছয়মাস অন্তর চাঁদা দিলে নামাজ রোজা না করার সার্টিফিকেট দেয়া। সৈয়দ সাহেবের আগমনে এসব কুসংস্কার বন্ধ হলো এবং মুসলমানগণ প্রকৃত দ্বীনের অনুসারী হলো। সৈয়দ সাহেবের এই বেনারস সফরের সময় বিখ্যাত তৈমুর বংশের কয়েকজন শাহ্জাদাও তাঁর বাইয়াত গ্রহণ করেন। বেনারস থেকে বিভিন্ন স্থান হয়ে সৈয়দ সাহেব সুলতান পুরের গোলাম হোসেন খানের সৈন্য শিবিরে উপস্থিত হন। লক্ষ্মৌ সরকারের পক্ষে গোলাম হোসেন সুলতান

পুরের হাকিম ছিলেন। সৈয়দ সাহেবের আগমনে বহু সৈন্য তাঁর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে। সৈয়দ সাহেবের কানপুর সফরের সময় আল্লাবখশ্ খান, শমশির খান, মেহেরবান খান এবং রমজান খান নামক চারজন প্রতিষ্ঠিত যুবক তার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। সৈয়দ সাহেবের অপরাপর সাথীদের মতো এই চারজন ও তাঁর সাথে রওয়ানা হলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সৈয়দ সাহেবের সাথেই ছিলেন। এই চারজনের একজন মেহেরবান খান ১১৭৪ হিজরীতে মারা যান। বাকী তিনজন বালাকোটের জিহাদে শহীদ হন। কানপুর থেকে সৈয়দ সাহেব ঘানঝাউ জাহানাবাদ এবং ফতেহ্পুর হয়ে দালমু পৌছান। দালমুতে সৈয়দ সাহেবের এক অনুসারী মাওলানা মাযহার আলী শিয়াদের তাজিয়া মিছিলের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মাওলানাকে গ্রেফতার করে। পরে মাওলানা যামিনে মুক্তি পেয়ে এলাকা ছেড়ে চলে যান। এ খবর পেয়ে সৈয়দ সাহেব খুব অসন্তুষ্ট হন। মাওলানা মাযহার আলীকে ডেকে পাঠান এবং বললেন, "আপনার বাইয়াত ভেঙ্গে গেছে, আবার বাইয়াত গ্রহণ করুণ এবং নিজের এলাকায় চলে যান। যে কোন বিপদ এলে মাথা পেতে নিবেন।" সৈয়দ সাহেব তাঁর শিষ্যদিগকে এধরনের শিক্ষাই দিতেন। জীবন বাজী রেখে আল্লাহর দ্বীন বাস্তবায়নের আন্দোলন করেই যেতে হবে। ১৮০ জন সাথী নিয়ে সৈয়দ আহমদ অতঃপর লক্ষ্ণৌ রওয়ানা হলেন। এখানকার কান্দাহারী সেনা ছাউনীতে তাঁর ভাগনে আবদুর রহমান চাকুরী করতেন। মামার আগমনের অপেক্ষায় তিনি সেখানে ছোলা ভাজি, গুড়, লবণ, মরিচ ইত্যাদি সংগ্রহ করে রেখে দিলেন। দুপুরে সৈয়দ সাহেব তাঁর সঙ্গী সাথীসহ সেনা ছাউনিতে পৌঁছে একমুঠো ছোলা খেয়ে পানি পান করে বিশ্রাম নিলেন। জোহরের নামাজের পর থেকে লোক সমাগম শুরু হলো, আগত

লোকদের প্রায় সকলেই সৈয়দ সাহেবের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। লক্ষ্ণৌতে সৈয়দ সাহেব দু'মাস অবস্থান করেন, প্রতি জুমার নামাজের পর তাঁর বিশিষ্ট সহচর মাওলানা আবদুল হাই উপস্থিত জনতার সম্মুখে ইকামতে দ্বীনের আন্দোলন সম্পর্কে ওয়াজ করতেন। এই সফরে যে সব লোক বাইয়াত গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে মাওলানা আশ্রাফ আলী, মাওলানা ইমাম উদ্দীন বাঙ্গালী, মৌলবী সৈয়দ মাখদুম, মৌলবী বাসেত, আবুল হাসান নাসিরাবাদী, আবদুল্লাহ ফেরেঙ্গী মহল্লী, মৌলবী রহীম উল্লাহ, মৌলবী নজীব উল্লাহ্ বাঙ্গালী, শাহ ইয়াকিনুল্লাহ্ লাখনবী, হাফেজ আবদুল ওয়াহেদ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লক্ষ্ণৌ সফরের সময় বহু শিয়া মুসলমান নিজেদের সকল প্রকার বেদ'য়াতী অনুষ্ঠান বর্জন করে সৈয়দ সাহেবের নিকট খাঁটি মুসলমান হিসেবে বাইয়াত গ্রহণ করেন। কিন্তু স্থানীয় শিয়া নেতৃবৃন্দ এতে ভীত হয়ে সরাসরি সৈয়দ সাহেবের নিকট লোক মারফত খবর পাঠালেন, যেন কোন শিয়াকে বাইয়াত করানো না হয়। উত্তরে সৈয়দ সাহেব বললেন "আমি সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ থেকে বিরত হতে পারি না। কাউকে আমি জোর জবরদস্তি উপদেশ দান করি না। যে আমার নিকট আসবে তাকে আমি অবশ্যই সত্যের বাণী শুনাবো।" শেষ পর্যন্ত স্থানীয় জনৈক কর্তা ব্যক্তি হুমকী দিলেন, যদি সৈয়দ আহমদ তাঁর কাজ থেকে বিরত না হয়, তাহলে তাঁর আস্তানা ধ্বংস করার জন্য দু'চারটি তোপই যথেষ্ট। সৈয়দ সাহেব উত্তর পাঠালেন, "আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ আমার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। সত্যের প্রচার থেকে বিরত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হাজার তোপকে আমি ভয় করিনা। আল্লাহ্ আমার সহায়।"

সৈয়দ সাহেবের দৃঢ়তা দেখে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নরম হয়ে গেল। এমনিভাবে সৈয়দ সাহেব ব্যাপক হারে দাওয়াতে দ্বীন ও কর্মী সংগ্রহের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। সৈয়দ সাহেব দ্বীনের দাওয়াত বা ইসলামী আন্দোলনের আহ্বান নিয়ে যখন কোলকাতায় এলেন, এখানকার প্রায় সব মুসলমানই তাঁর আন্দোলনে যোগদান করেন। এছাড়া তৎকালীন বাংলাদেশের চব্বিশ পরগনাসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গ, সিলেট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, যশোর, ফরিদপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলা থেকে অসংখ্য মুসলমান কোলকাতা গিয়ে আন্দোলনের তালিকায় নিজেদের নাম অন্তর্ভূক্ত করান।

লক্ষ্নৌ সফরের সময় যে সমস্ত বিখ্যাত ব্যক্তি সৈয়দ সাহেবের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন, তাঁদের তালিকায় মাওলানা ঈমাম উদ্দীন বাঙ্গালীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার অধিবাসী ছিলেন তিনি। সৈয়দ সাহেবের খুবই অনুরক্ত ছিলেন। বাইয়াত গ্রহণের পর থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত সৈয়দ সাহেবের সাথী ছিলেন। সৈয়দ সাহেবের হজ্জ গমন উপলক্ষে মাওলানা ঈমাম উদ্দীন বাঙ্গালী নোয়াখালী সফর করেন এবং প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন নোয়াখালীবাসীকে সাথে করে নিয়ে আসেন। পরবর্তী সময়ে এঁরা সকলেই সৈয়দ সাহেবের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং ত্বরীকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলনের কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বাংলার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মুন্সী আমিন উদ্দীন আহ্মদ সৈয়দ সাহেবের হজ্জে যাওয়ার সময় বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর সাথী ছিলেন। মৌলবী ওয়ারেস আলী বাঙ্গালী নামের আর একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব প্রথমদিকে আন্দোলনের প্রাথমিক সদস্য

হিসেবে নাম লিখালেন। কিছুদিন কাজ করার পর সঠিক অর্থে আন্দোলন বুঝতে পেরে নিজের ভাগ্যকে আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেললেন এবং সৈয়দ সাহেবের হিজরতের সময় তিনিও নিজের জন্মভূমি এই সুজলা-সুফলা বাংলাদেশ ত্যাগ করে সীমান্তের পাহাড়িয়া এলাকার পাঞ্জাতারে বসতি স্থাপন করেন। এই আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে আরেকজন বাংলাভাষী মুসলমানের নাম পাওয়া যায়। তিনি হচেছন শেখ বুরহানুদ্দীন বাঙ্গালী। ইনিও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সৈয়দ সাহেবের সাথী ছিলেন।

হজ্জে যাওয়ার সময় সৈয়দ সাহেব বহুস্থান সফর করেন এবং দাওয়াতের কাজ চালাতে থাকেন। সৈয়দ সাহেবের এই সফরের সময় কোলকাতায় অবস্থানরত টিপু সুলতানের পুত্রগণ এবং তাদের স্ত্রীগণ তাঁর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। বার্মার জনৈক ব্যবসায়ী প্রায়ই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোলকাতা সফর করতেন। সৈয়দ সাহেবের কোলকাতা অবস্থানের সময় সৈয়দ হামযা নামক উক্ত স্বর্ণ ব্যবসায়ী বাইয়াত গ্রহণ করেন। সাধারণতঃ বার্মার লোকদের দাড়ি খুব কম হয়, কিন্তু সৈয়দ হামযার দাঁড়ি ছিল সম্পূর্ণ গাল ভরা এবং দীর্ঘ। তাই বার্মার শাসকগোষ্ঠীর নিকট তিনি খুব সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। সৈয়দ হামযা দেশে ফিরে মুসলমান জনসাধারণ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন মুসলিম কর্মকর্তার নিকট আন্দোলনের দাওয়াত দিলে বহু লোক তা গ্রহণ করেন। এভাবে ত্বরীকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলনের দাওয়াত বার্মায়ও প্রসার লাভ করে। ১২২৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই উপমহাদেশের সর্বত্র এ আন্দোলন সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে। সৈয়দ আহমদ এ বিস্তৃত ভূখন্ডে সর্বস্তরের মানুষের আশা-আকাংখার মূর্ত প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হন।

হজ্জের উদ্দেশ্য এবং সফরের সাংগঠনিক কাঠামো

অর্থ-সামর্থের দিক থেকে সৈয়দ সাহেবের উপর হজ্জ ফরজ ছিলনা। তারপরও প্রধানতঃ দু'টি উদ্দেশ্যে তিনি হজ্জ্ব করার নিয়ত করেন। প্রথমতঃ ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করার পূর্বে ইসলামের কেন্দ্রভূমি এবং খোদার ঘর জিয়ারত করাকে জরুরী মনে করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ উপমহাদেশে সে সময়ে হজ্জে যাওয়ার ব্যাপারে একটা ভুল ধারণা প্রচলিত ছিল যে-হজ্জে যাওয়া বিপদজনক এবং জীবনের নিরাপত্তা নেই, অতএব উপমহাদেশের কোন লোকের হজ্জে যাওয়া ফরজ নয়। এই ভুল ধারণা দূর করে উপমহাদেশে হজ্জের উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে উৎসাহ প্রদান করার জন্যই সৈয়দ আহ্মদ বহু প্রচার প্রোপাগান্ডা করে হজ্জে গমন করেন। তাঁর উভয় উদ্দেশ্যই সার্থক হয়েছিল। ইসলামের কেন্দ্রভূমি পবিত্র মক্কা এবং ইসলামী আন্দোলনের নেতা হযরত মুহাম্মদ সা.-এর রওজা মোবারক পবিত্র মদীনা জেয়ারত করা হলো। হজ্জের উদ্দেশ্যে সৈয়দ সাহেবের রওয়ানা হওয়ার কথা শুনে হজ্জের উপযুক্ত বহু লোক উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছিল। দীর্ঘদিন থেকে বন্ধ থাকা ইসলামের একটা মৌলিক ফরজ পুনরায় চালু হলো। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই সৈয়দ সাহেব নিজ পরিবার, পরিজন, ভক্ত, আন্দোলনের কর্মী এবং হজ্জের উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গসহ প্রাথমিকভাবে প্রায় সম্বলহীন অবস্থায় চারশত লোক নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে রায়বেরেলী ত্যাগ করেন। রওয়ানা হওয়ার পূর্বে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানের বহু লোককে সৈয়দ সাহেব হজ্জে যাওয়ার জন্য দাওয়াত করেন। এতে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যায়। কাফেলা রায়বেরেলী থেকে দালমুর, ধাই ধমধমা, ডুগডুগী,

গাতনা, জাহানাবাদ হয়ে এলাহাবাদ পৌঁছে। এই সময় কাফেলার লোকসংখ্যা চারশত থেকে সাড়ে সাতশত হয়ে যায়। এখান থেকে হুগলী হয়ে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কাফেলা কোলকাতা পৌঁছে। এখানে প্রায় তিন মাস কাল কাফেলা অবস্থান করে। হজ্জে রওয়ানা হওয়ার জন্য কোলকাতা থেকে ১০টি জাহাজ ভাড়া করা হয়। প্রত্যেক জাহাজের জন্য একজন আমীর, একজন কাপ্তান মনোনীত করা হয়। এছাড়া জাহাজের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী লোক বন্টন করে দেয়া হলো।

"দরিয়া বাকা" জাহাজে ১৫০ জন যাত্রীর আমীর ছিলেন সৈয়দ আহ্মদ নিজে। সৈয়দ আবদুর রহমানকে কাপ্তান নিযুক্ত করা হলো এই জাহাজের। "ফত্হুলবারী" জাহাজের যাত্রী ছিল ৭০ জন, মৌলবী আবদুল হক ছিলেন আমীর আর কাপ্তান হলেন আবদুল্লাহ্ কেজাজ আরব। "আতিয়াতুর রহমান" নামক জাহাজে কাজী আহ্মদ উল্লাহ্ মিরাঠি ও মুহাম্মদ হুসেন তুর্ক্কে যথাক্রমে আমীর এবং কাপ্তান নিযুক্ত করা হয়। এই জাহাজে মোট যাত্রী সংখ্যা ছিল ৬৭ জন। মৌলবী ওয়াহেদ উদ্দীনের নেতৃত্বে ৫০ জন যাত্রী সহ "গোরাবে আহমদী" জাহাজের কাপ্তান ছিলেন আহ্মদ তুরক। "আতিয়াতুর রহমান" এবং "গোরাবায়ে আহমদী" এই দু'টি জাহাজ ১১টি কামানে সজ্জিত ছিল। "ফাতহুল করীম" জাহাজের কাপ্তান হলেন মুহাম্মদ হোসেন মাশকাতী। এখানে ৭৬ জন যাত্রীর নেতা ছিলেন মিয়া দীন মুহাম্মদ। ১৭৫ জন যাত্রীসহ "ফয়েজে রাব্বানী" জাহাজের আমীর ছিলেন শাহ্ ইসমাইল। "ফয়েজুল করীম" জাহাজের ৫০ জন যাত্রীর আমীর কাজী আবদুস সাত্তার। পীর মুহাম্মদ রায়বেরেলী "আব্বাসী" জাহাজের ৩০ জন

যাত্রীর নেতা ছিলেন। "তাজ" জাহাজের ৬৫ জন যাত্রীর আমীর ছিলেন কাদের শাহ্ হারইয়ানবী। "তাফহুর রহমান" জাহাজের আমীর ছিলেন মুহাম্মাদ ইউসুফ কাশ্মিরী। এতে যাত্রী সংখ্যা ছিল ২০ জন। শেষের পাঁচটি জাহাজের কাপ্তানদের নাম জানা যায়নি। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সৈয়দ আবদুর রহমান, মাওলানা আবদুল হাই, শায়খ আবদুল্লাহ্ প্রমুখ সৈয়দ সাহেবের জাহাজে তাঁর সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সফরের সময় প্রত্যেক জাহাজে প্রতিদিনের কর্মসূচী ছিলঃ বাদ ফজর দোয়ায়ে হিজবুল বাহার পাঠ, সূরা যখ্রুখের প্রথম রুকু তেলাওয়াত, প্রশ্নোত্তরে মাসলা-মাসায়েল শিক্ষার আসর, বিশ্রাম, জোহরের নামাজ, রান্না-বান্না, আছরের নামাজ, ঈমান সম্পর্কে আলোচনা, মাগরিবের নামাজ, সাধারণ আলোচনা, এশার নামাজ, বিশ্রাম। এমনিভাবে বিভিন্ন স্থান হয়ে মক্কা শরীফে হজ্জ আদায় এবং মদীনা শরীফ জিয়ারত করে দুই বছর দশমাস পর ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সৈয়দ সাহেব পুনরায় রায়াবেরেলীতে পৌঁছেন।

সংগঠনের মূলনীতি

সৈয়দ আহ্মদের প্রতিষ্ঠিত ত্বরীকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলনের মূলনীতি সম্পর্কে উইলিয়াম হান্টার তাঁর "দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস" গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "তাঁর একমাত্র শিক্ষা হলো, আল্লাহর বন্দেগী করা এবং একমাত্র আল্লাহ্রই সন্তুষ্টি ভিক্ষা করা, যেখানে কোন মানবীয় আচার বা অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তীতা একেবারেই নেই, অর্থাৎ ফেরেশ্তা, জ্বীন, পরী, পীর, মুরীদ, আলেম, সাগরেদ, রসূল বা ওলী, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার ক্ষমতা কারোরই নেই।" এ ধ্রুবসত্য বিশ্বাস

করা আর উপরোক্ত কোন সৃষ্টজীব থেকে নিজের ইচ্ছা বা আশা-আকাংখা পূরণের জন্য যে কোন রকম কার্য করণ থেকে বিরত থাকা, কারুর প্রতি অনুগ্রহ করার বা বিপদ ত্রাণ করার ক্ষমতায় বিশ্বাস না করা, স্বার্থসিদ্ধির আশায় কোন পয়গাম্বর, ওলী, দরবেশ বা ফেরেশতার উদ্দেশ্যে কিছু দান না করা, একমাত্র আল্লাহর শক্তির নিকট নিজেকে অসহায় বিবেচনা করা।

সৈয়দ সাহেবের আন্দোলনের দ্বিতীয় মূলনীতি সম্পর্কে উইলিয়াম হান্টার বলেন, "সত্য ও অবিকৃত ধর্ম হচেছ প্রাত্যহিক জীবনে কেবল সেই সব এবাদত-প্রার্থনা করা ও আচার-নীতিগুলো আঁকড়ে ধরা যা রসুলুল্লাহর সা. জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। বিয়ে সাদীতে যৈদ'য়াতী উৎসব, মৃত্যুতে শোক উৎসব, মাজার সজ্জিত করন কিংবা কবরের উপর বড় বড় সৌধ নির্মান, পথে পথে মাতম শোভা যাত্রা ইত্যাদি পরিহার করা। সমাজে চালু অথচ শরীয়াতের দৃষ্টিতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনুষ্ঠানাদি যথাসাধ্য বন্ধ করে দেয়া, মোট কথা যে কোন নামেই হোক, শিরক থেকে দূরে থাকতে হবে এবং যাবতীয় বিদ'য়াতকে বর্জন করতে হবে। যেহেতু মহিলাদের কোলে জাতির ভবিষ্যৎ বংশধর লালিত-পালিত হয় এবং মহিলাদের কাছ থেকেই শিশুরা প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করে থাকে, যেহেতু বিশেষভাবে মহিলাদেরকে সর্বক্ষণ শিরক থেকে পবিত্র রাখার জন্য কর্মীদের প্রতি সৈয়দ সাহেবের কঠোর নির্দেশ ছিল। কারণ মহিলাদের মন খুব নরম। অল্পতেই তারা শিরক- এর প্রতি ঝুঁকে যেতে পারে। যাদের উপর জাতির ভবিষ্যত নির্ভরশীল, সেই মহিলা সম্প্রদায়কে সঠিক ইসলাম এবং সততা শিক্ষা দেয়ার প্রতি

সৈয়দ সাহেব অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। মৌলিকভাবে উপরোল্লিখিত এই দু'টি মূলনীতিকে ভিত্তি করে সৈয়দ সাহেব তাঁর আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করেন।

সংগঠন ঃ প্রশিক্ষণ ঃ ক্যাডার তৈরী

উপমহাদেশে আন্দোলনের গভীরতা, ময়দানে কর্মীদের চরিত্র ও মনোবল এবং সংগঠনের ব্যাপকত্তা ও মজবুতী সম্পর্কে ধারণা নেয়ার জন্য সৈয়দ আহ্‌মদ একবার সারা উপমহাদেশে প্রায় বছরাধিককাল ধরে এক জরীপ-সফর সম্পন্ন করেন। এই জরীপ-সফরের পরপরই তিনি কোন পার্থিব বিশেষ ধন-সম্পদ এবং উপকরণ ব্যতিরেকেই শুধুমাত্র দ্বীনের দাওয়াত, ঈমানী চেতনা, ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্‌র বলিষ্ঠ প্রত্যয়কে সম্বল করে ময়দানে নেমে পড়েন। কর্মী ও সহযোগীদের সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্দোলনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সৈয়দ সাহেব পুরো উপমহাদেশকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করেন। পাটনায় আন্দোলনের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। নিজের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহচরকে তিনি আঞ্চলিক প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করেন। নিজে পাটনায় থেকেই আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সারা উপমহাদেশে আন্দোলন পরিচালনা করেন। বাংলাদেশ অঞ্চলের প্রতিনিধি ছিলেন মাওলানা বেলায়েত আলী।

ব্যাপক দাওয়াতী অভিযানের ফলে উপমহাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে ত্বরীকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলনের শিকড় মাটির গভীরে সুদূর প্রসারী ভাবে বিস্তার লাভ করে। পুরো উপমহাদেশকে আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের

মধ্যে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় বন্টন করে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সৈয়দ আহ্‌মদ একটা ছায়া সরকার গঠন করেন। কঠিন এবং বলিষ্ঠ সাংগঠনিক শৃংখলার কারণে ৪০ বছর পরেও বৃটিশ সরকার এই ছায়া সরকার সম্পর্কে জানতে পারেননি। আদর্শের চাহিদা ও মেজাজ অনুযায়ী কর্মী গঠন করা ছিল এ আন্দোলনের এক বিশেষ কাজ। সৈয়দ সাহেব ক্যাডারভিত্তিক আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি প্রায় সবসময়ই বলতেন, "আন্দোলনের মেজাজ অনুযায়ী কর্মী তৈরী না হলে সফলতা সম্ভব নয়।" সংগঠনের জেলা সদর দপ্তরগুলোতে সাধারণ বাইয়াত গ্রহণকারীদেরকে প্রশিক্ষণের পর কর্মী বাছাই করা হতো। এরপর কর্মীদের মধ্যে চলতো প্রশিক্ষণ। তুলনামূলকভাবে অগ্রসর কর্মীদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য এখান থেকে পাটনার কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠানো হতো। কেন্দ্রীয় দপ্তরের প্রশিক্ষণ একটু দীর্ঘ সময়ের জন্য হতো। এখান থেকে অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদেরকে আরো দীর্ঘ প্রশিক্ষণের পর নিজ নিজ অঞ্চলে আন্দোলনের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করা হতো। সৈয়দ সাহেব সরাসরি আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন এবং তাদেরকে পরিচালনা করতেন। সাংগঠনিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সাধারণ মুসলমান থেকে যাঁরা বাইয়াত গ্রহণ করেছেন, তাঁরা আন্দোলনের সমর্থক। পরের স্তর হচ্ছে অগ্রসর কর্মী এরপর মুজাহিদ। অগ্রসর মুজাহিদদিগকে বিভিন্ন অঞ্চলের এবং বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বশীল নিযুক্ত করা হতো।

ব্যাপকভাবে দাওয়াত প্রদান, কর্মী গঠন, আন্দোলনের দৃষ্টিভংগী প্রচার এবং সাংগঠনিক মজবুতীর জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রচুর ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ করা হয়েছে। এই সাহিত্যবন্যা ত্বরীকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলনকে বহুগুনে অগ্রসর করে দিয়েছে। অসংখ্য ইসলামী

সাহিত্যের মধ্যে সীরাতুল মুস্তাকীম, কাসিদা, 'সির-ই-ওয়াকেয়া', 'তাওয়ারিখ-কায়সার রুম', 'আছার-মাহ্শার', 'হেদায়েতুল মুসলেমিন', 'তানবীরুল আইনাইন', 'তাকবিয়াতুল ঈমান', 'তায্কীরুল আখাওয়াই', 'নাসীহাতুল মুসলেমীন', 'তামবীহুল গাফেলীন' ইত্যাদি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও প্রচুর কবিতা, গান, গজল, রচনা করে প্রচার করা হতো। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এইসব কবিতা, গান, ও গজল ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে "সীরাতুল মুস্তাকীম" নামক গ্রন্থখানি সৈয়দ সাহেব নিজেই রচনা করেন। দিল্লী থাকাকালীন সময়ে তিনি এই গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করেছিলেন। এব্যাপারে শাহ ইসমাইল ও মাওলানা আবদুল হাই তাঁকে সহযোগিতা করেন। সৈয়দ সাহেব ডিকটেট্ করতেন পালাক্রমে শাহ্ সাহেব ও মাওলানা সাহেব ডিকটেশান অনুযায়ী লিখে পুনরায় সৈয়দ সাহেবকে পড়ে শুনাতেন। মনপুত না হলে আবার বলতেন। কখনো কখনো একটি বিষয়কে কয়েকবার লিখতে হয়েছে।

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ধারণা

জিহাদ শব্দটি আরবী 'জুহ্দ' শব্দ থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ মেহ্নত বা পরিশ্রম করা এবং কোন কাজ করার উদ্দেশ্যে যে কোন প্রতিবন্ধকতাকে ডিঙ্গিয়ে সর্বান্তকরণে অগ্রসর হওয়া। শরীয়ত মতে জিহাদের অর্থ "শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি সামর্থ সহকারে প্রকাশ্যে এবং গোপনে চেষ্টা করা।" প্রকাশ্যে অর্থ শত্রুপক্ষ আক্রমণ করলে উন্মুক্ত অস্ত্র হাতে তাদের প্রতিহত করা, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হয় এবং শত্রুপক্ষ

পরাজয় বরণ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। প্রয়োজনে জীবন দিতেও নির্দিধায় প্রস্তুত থাকা। গোপনে অর্থ শয়তানের যাবতীয় চক্রান্ত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা, অর্থাৎ সত্যের পথে নিজে একা বা সম্মিলিতভাবে যে প্রচেষ্টা চালানো হয়, সত্যের পতাকা উড্ডীন রাখার জন্য যেসব জীবন উৎসর্গ করা হয়, এগুলো সবই জিহাদ। অসত্যের অন্ধকারে যারা সত্যের আওয়াজ বুলন্দ করে, শত্রুর বন্দীখানায় কষ্ট সহ্য করে, ইসলামী আন্দোলনের পথে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে, গুলী বিদ্ধ হয়, ফাঁসীতে ঝুলে, বাড়ী ঘর ত্যাগ করে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব থেকে চিরদিনের জন্যে বিছিন্ন হয়ে যায়, তারাই মুজাহিদ। সকল মুসলমানের অন্তরে এই উৎসাহ এবং উদ্দীপনাই সৈয়দ সাহেব সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। কালেমা তাইয়্যেবা পাঠকারী প্রত্যেক মুসলমানকেই তিনি আল্লাহর পথে মুজাহিদ হিসেবে তৈরী করার বাসনা নিয়ে সারা জীবন কাজ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ত্বরীকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীর মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তারা নিজেকে এবং নিজের সম্পদকে দ্বীনি আন্দোলনের পথে উৎসর্গ করাকে জীবনের চরম এবং পরম সৌভাগ্য বলে মনে করতেন, আর যখনই কোন মুজাহিদ শাহাদত বরণ করতেন, তখনই বলা হতো, "তিনি তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছেন"। সে যুগে একমাত্র সৈয়দ সাহেব ও তাঁর অনুসারীরা এমন উদাহরণ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। তখন কোন কোন আলেম ফতওয়া দিয়েছিলেন, জিহাদ ফরজে কেফায়া। কিছু সংখ্যক মুসলমান জিহাদে অংশ গ্রহণ করলেই সমস্ত মুসলমানের পক্ষ থেকে ফরজ আদায় হয়ে যায়। অতএব, জিহাদে সকলের অংশ গ্রহণের প্রয়োজন নেই। কেফায়া শব্দটির অর্থ

যথেষ্ট হওয়া বা যথার্থ হওয়া। অর্থাৎ শত্রুপক্ষের মোকাবিলায় মুসলমান সৈন্য বা মুজাহিদদের সংখ্যা যথেষ্ট হওয়া এবং জিহাদ করার স্থান-কাল যথার্থ হওয়া। স্থান-কাল না বুঝে শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক মুসলমান জিহাদে অংশ গ্রহণ করলেই সব দায়িত্ব শেষ-কেফায়ার অর্থ এটা নয়। এছাড়া যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ইসলাম তার মর্যাদা সহ প্রতিষ্ঠিত নেই, এই অবস্থায় ফরজে কেফায়ার আপত্তি কোন্ কাজে লাগে? এখানে জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ্ ফরজে আইনের স্থানে অবস্থান করছে।

জিহাদের প্রস্তুতি ঘোষণা

হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর একদিন সৈয়দ সাহেব রায়বেরেলীতে তাঁর সহকর্মীদের সাথে যিকির-আযকারে মশগুল ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি সকলকে ডেকে বললেন, "যিকির বন্ধ করুন, এখন থেকে জিহাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অধিকাংশ সময় ব্যয় করতে হবে।" অনেকেই বিস্মিত হলেন। প্রশ্ন উঠলো, যিকিরের মত নেকীর কাজ বাদ দিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন কি? উত্তরে সৈয়দ সাহেব বললেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে যিকির-আযকারের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমাদের সামনে উপস্থিত। আল্লাহ্‌র নামে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। জিহাদের সামনে অন্যসব নফল ইবাদত মূল্যহীন। জিকির-আযকার হচেছ জিহাদের পরবর্তী কাজ। যদি কেউ সারাদিন রোজা রাখে এবং সারারাত ইবাদত করে এমনকি নফল নামাজ পড়তে পড়তে পা ফুলিয়ে ফেলে, তার স্থান ঐ ব্যক্তির সমান হবে না, যে ব্যক্তি কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র

জিহাদের নিয়তে একঘন্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। কারণ জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ্ হচেছ মারেফাতের সর্বোচচ স্তর। এটা আম্বিয়ায়ে কেরামের পদ্ধতি। প্রত্যেকটি মুসলমানই যেন জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ্র নিয়ত রাখে এবং এ মহান দায়িত্বের কথা যেন কেউ কখনো ভুলে না যায়। এই ঘোষণার পর থেকেই আন্দোলনের কর্মীরা ক্রমান্বয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে শুরু করেন।

মুজাহিদ বাহিনী

ত্বরীকায়ে মোহাম্মদী আন্দোলনের কর্মীদের মাঝে বিন্যস্ত স্তরগুলির মধ্যে "মুজাহিদ" স্তর ছিল সর্বোচচ। আল্লাহ্র দেয়া জীবন বিধানকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে জানমাল কোরবান করার নিয়তে সদা প্রস্তুত থাকার জন্য সৈয়দ আহ্মদ মুজাহিদ স্তরের কর্মীদের নির্দেশ জারী করেছিলেন। যেমন কথা তেমন কাজ। পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে যে, এই মুজাহিদ স্তরের কর্মীরা আন্দোলন ও সংগঠনের ভালো মন্দের সাথে নিজেদের ভাগ্যকে একাকার করে ফেলেছিলেন। উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত খোদার পথে জীবন উৎসর্গকারী একদল খাঁটি ঈমানদার নিয়ে গড়ে উঠেছিল সৈয়দ সাহেবের মুজাহিদ বাহিনী। এই আত্মত্যাগকারী কর্মীদের পক্ষে আন্দোলন এবং সংগঠন থেকে সরে দাঁড়ানো ছিল অসম্ভব। সৈয়দ সাহেব যদিও প্রায় সবসময়েই যিকির-আযকার, নফল ইবাদত এবং ওয়াজ-নসীহতে সময় অতিবাহিত করতেন, কিন্তু তিনি সর্বক্ষণ সৈনিক বেশে থাকতেন। প্রথম দেখায় অনেকে তাকে চাকুরিরত সৈনিক মনে করতো। তাঁর কোমরে সর্বদা পিস্তল এবং ছোরা

বাঁধা থাকতো। ত্বরীকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলন শুধু ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা। ইসলামী জিহাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে সৈয়দ সাহেব কর্মীদের গড়ে তুলেছিলেন। উল্লিখিত কারণে ইতিহাসে এই আন্দোলনের কর্মী বাহিনীকে কখনো কখনো মুজাহিদ বাহিনী বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে।

অর্থ সংগ্রহ পদ্ধতি

কর্মীরা সৈয়দ সাহেবকে "ঈমাম" বলে সম্বোধন করতো, ঈমাম সাহেব অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় দেখাশুনা করার জন্য মৌলবী ইউসুফকে কেন্দ্রীয় বায়তুল মালের দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন। বায়তুল মালের অর্থ সংগ্রহ করা, সংরক্ষণ করা, প্রয়োজনীয় খাতে খরচ করার এখতিয়ার ছিল মৌলবী ইউসুফের উপর। আয় ব্যয়ের সমস্ত হিসাব নিকাশও তাঁর কাছেই ছিল। সংগঠনের কর্মীদের পকেটের পয়সা এবং দেশব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অগনিত সমর্থক ও শুভাকাংখীদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত অর্থই সংগঠনের আয়ের প্রধান উৎস ছিল। বড় বড় মুসলিম ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। আন্দোলনের গরীব কর্মীদের জন্য সাদকা ও ফেৎরা আদায় করা হতো। কর্মীদের প্রতিটি পরিবারে "মুষ্টি চাউল" রাখার নিয়ম চালু ছিল এবং তা অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্টার সাথে আদায় করা হতো। এ সমস্ত চাউল বিক্রয় করে উপার্জিত টাকা আন্দোলনের কাজে ব্যয় করা হতো। এছাড়াও বিশেষ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের নিকট থেকে এককালীন জরুরী অর্থ সংগ্রহ করা হতো। জরুরী পরিস্থিতিতে মুসলমান মহিলারা নিজেদের অলঙ্কারাদী পর্যন্ত খুলে আন্দোলনের তহবিলে জমা দিয়েছে বলে ইতিহাসে রয়েছে।

আন্দোলনের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার

যখনই ইসলামী আন্দোলন ব্যাপকতার পথে পা বাড়ায়, তখনই এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এটা যেকোন ইসলামী আন্দোলনের জন্য স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। অতীতের সমস্ত ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এর সত্যতা দিবালোকের মত পরিস্ফুটিত হয়ে উঠবে। বেশী অতীতে না গিয়ে বর্তমান বিশ্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই স্পষ্টতঃ দেখা যাবে, যেসব স্থানে ইসলামী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে এবং একটু ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, সেখানে শুরু হয়েছে অভ্যন্তরীন, দেশীয়, এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। ত্বরীকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ইংরেজগণ আন্দোলনের ব্যাপকতা দেখে ক্রমেই ভীত হতে লাগলো এবং উপমহাদেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে দেয়। যেখানে সৈয়দ আহ্মদ সরাসরি বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রস্তুতি নিচেছন, সেখানে কর্মীদের মধ্যে জিহাদের উদ্দীপনাকে নিস্তেজ করে দেয়ার জন্য ইংরেজগণ প্রচার করলো যে, সৈয়দ সাহেব ইংরেজদের শুভাকাংখী এবং বন্ধু। দ্বিতীয়তঃ সৈয়দ সাহেবের ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কেও বিভিন্ন ধরণের বিভ্রান্তি প্রচার করা হতো। বিশেষভাবে এই আন্দোলনকে "ওয়াহাবী আন্দোলন" বলে প্রচার চলতো এবং ওয়াহাবী আন্দোলন মুসলমানদের ঈমানের প্রতি হুমকিস্বরূপ বলে মিথ্যা ধারণা দেয়া হতো। সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজরা সৈয়দ সাহেবকে সুন্নী বিরোধী একজন ওয়াহাবী বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে। যার ফলশ্রুতিতে এখনো বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে "ওয়াহাবী" বনাম "সুন্নী" বিতর্ক চালু রয়েছে। তৃতীয়তঃ শিয়া

মতবাদের মধ্যে বেশ কিছু বিদ'য়াতী আনুষ্ঠানিকতা থাকায় সৈয়দ সাহেব ও তাঁর সাথীরা বিভিন্নভাবে এর বিরোধিতা করতেন। ইংরেজগণ এটাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে শিয়া মতাবলম্বীদের মধ্যে সৈয়দ সাহেবের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতো। চতুর্থতঃ ইংরেজগণ বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে সৈয়দ সাহেবের কয়েকজন সহচরকে ক্রয় করতে চেয়েছিল, কিন্তু সফল হয়নি। পঞ্চমতঃ ইংরেজগণ নিরক্ষর, অশিক্ষিত, অজ্ঞ, ধর্মান্ধ বলেও সৈয়দ সাহেবের বিরুদ্ধে প্রচার করতো।

মুহাম্মদ বিন্ আবদুল ওয়াহ্হাব নজদীর সাথে সামঞ্জস্য

বর্তমান সৌদী আরবের রাজধানী রিয়াদ-এর পার্শ্ববর্তী একটি এলাকার নাম "নজদ"। এক সময়কার "নজদ" প্রদেশের রাজধানী ছিল এই রিয়াদ শহর। এখানে ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে শেখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব নামে একজন ইতিহাসখ্যাত সংস্কারকের জন্ম হয়। 'সে সময় সমস্ত মুসলিম বিশ্ব অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং অধঃপতনের চরম পর্যায়ে ছিল। মুহম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব দামেস্কের ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং তাঁর খ্যাতনামা ছাত্র হাফেজ ইবনুল কাইয়েমের রচনাবলী এবং বিপ্লবী ভাব ধারার অনুসারী ছিলেন। মুসলিম জাহানের তৎকালীন ব্যাপক দুর্গতি বিশেষ করে ইসলামের কেন্দ্রভূমি আরব দেশে তাওহীদ বিরোধী ভাবধারা এবং শির্ক-বিদ'য়াতের ছড়াছড়ি দেখে তাঁর অন্তর কেঁপে ওঠে। আরবরা তখন নিজেদের গৌরব দীপ্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবচেতন, রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বঞ্চিত, সর্বদিক থেকেই তখন তারা ছিল শোষিত-নিপীড়িত, নৈতিক ও

চারিত্রিক দিক থেকে ছিল অধঃপতনের চরম সীমায়। এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য, মুসলমানদেরকে তাদের সঠিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য মুহম্মাদ বিন্ আবদুল ওয়াহ্হাব এক আন্দোলন গড়ে তোলেন। জনৈক মার্কিন ঐতিহাসিক LOTHROP STODDARD-এর NEW WORLD OF ISLAM নামক গ্রন্থে এই আন্দোলন সম্পর্কে বলা হয়। "ওয়াহ্হাবী আন্দোলন একটি অনাবিল সংস্কার আন্দোলন ব্যতীত আর কিছুই নয়। অলৌকিকতার ধারণা সংশোধন, সকল প্রকার সন্দেহ সংশয়ের নিরসন, কুরআনের মধ্যযুগীয় প্রক্ষিপ্ত তফসীর ও নব আবিস্কৃত টীকা টিপ্পনীর প্রতিবাদ, বিদ'য়াত ও আওলিয়াগণের পূজার নিবৃত্তি সাধন এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। মোট কথা, ওয়াহ্হাবী আন্দোলন মানে ইসলামের প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষার দিকে প্রত্যাবর্তন। অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ, ইসলামের রুকন ফরজসমূহ দৃঢ়ভাবে পালন করা, নামাজ ও সিয়ামকে যথাযথভাবে আদায় করা, সহজ ও অনাড়ম্বর জীবনপ্রণালী অনুসরণ, রেশমী কাপড়ের ব্যবহার, খাদ্যের বিলাসিতা, মদ্যপান, আফিম ও তামাক সেবন প্রভৃতি ক্ষতিকর জিনিস বর্জন করা।"

এই মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের আন্দোলন পরিচালিত হয় প্রধানতঃ সাতটি মুলনীতির ভিত্তিতে।

(এক) আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা।

(দুই) মানুষের ও খোদার মধ্যবর্তী কারো অস্তিত্বে বিশ্বাস না করা। ওলি তো দূরের কথা, স্বয়ং রাসূলুল্লাহর সা. মধ্যবর্তী হওয়ার কোন অধিকার নেই।

(তিন) সরাসরি কুরআনের অর্থ ও শিক্ষা গ্রহণের অধিকার মুসলমান মাত্রেরই আছে-এ কথায় বিশ্বাস করা।

(চার) মধ্যযুগে এবং বর্তমানে যেসব বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান ইসলামে ঢুকে পড়েছে, সেগুলি সরাসরি প্রত্যাখান করা।

(পাঁচ) ঈমাম মাহ্দীর অবির্ভাবের আশায় সর্বদা প্রস্তুত থাকা।

(ছয়) কার্যকরীভাবে কাফেরদের সাথে জিহাদ করা ফরজ, সার্বক্ষণিক সে বিষয়ে বিশ্বাস রাখা।

(সাত) অকুণ্ঠচিত্তে নেতার আনুগত্য করা।

সৈয়দ আহ্মদের ইসলামী আন্দোলন এবং মুহাম্মদ বিন্ আবদুল ওয়াহ্হাবের সংস্কার আন্দোলনের মূলনীতির সাথে অনেকটা সাদৃশ্য থাকার ফলে অসতর্কতা বশতঃ অনেকেই উপমহাদেশের এ আন্দোলনকেও ওয়াহ্হাবী আন্দোলন আখ্যা দিয়েছিল।

অবশ্য কেউ কেউ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে সাধারন মুসলমানদেরকে আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এ আন্দোলনকে ওয়াহ্হাবী তথাকথিত ঐতিহাসিকগণও সচেতনভাবেই হোক আর অচেতনভাবেই হোক এ মারাত্মক ভুলটি করেছেন।

শরীয়াতুল্লাহ ও তিতুমীরের আন্দোলন

ঈমাম সৈয়দ আহমদের আন্দোলন চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের ফরিদপুর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় "ফারায়েজী আন্দোলন" নামে অপর একটি ইসলামী সংস্কার আন্দোলন চলছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন হাজী শরীয়াতুল্লাহ। এ আন্দোলনটি ত্বরীকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলনের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। বাংলার মাটিতে যখন হাজী শরীয়াতুল্লাহ বিদ্রোহের বীজ বপন করছিলেন, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর বিপ্লবাত্মক আন্দোলন যখন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের আকাশ-

মাটি তোলপাড় করছিল, তখন উপমহাদেশের পূর্ব প্রান্তে আর একজন মর্দে মুজাহিদ বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে ছিলেন, নাম তাঁর সৈয়দ নিসার আলী, যিনি তিতুমীর নামে সমধিক খ্যাত। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণা জেলার চাঁদপুর গ্রামে তিতুমীর জন্মগ্রহণ করেন। সৈয়দ আহ্মদ ব্রেলভী যখন মক্কায় হজ্জ্ব করতে যান, ঘটনাচক্রে তিতুমীরও সেবার মক্কা শরীফ গিয়েছিলেন। তিতুমীর সেখানে সৈয়দ সাহেবের সান্নিধ্য পান এবং তাঁর দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরে ইসলামী সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তিতুমীরের এ সংস্কার আন্দোলন চব্বিশ পরগণা, ফরিদপুর ও নদীয়া জেলায় জোরদার হয়েছিল। ওদিকে আন্দোলনের চূড়ান্ত সফলতার পূর্বেই ১৮৪০ সালে হাজী শরীয়তুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর আদর্শের প্রতি অবিচল ছিলেন। এদিকে ইংরেজদের তোপের মুখে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা উড়ে যায়। মোট কথা বাংলাদেশ অঞ্চলের বর্তমান ইসলামী আন্দোলন উড়ে এসে জুড়ে বসা কোন আন্দোলন নয়। শত শত বছরের উত্তরাধিকার রয়েছে এখানকার ইসলামী আন্দোলনের।

সীমান্তে জিহাদের কেন্দ্র স্থাপনের কারণ

ত্বরীকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলনের সদর দপ্তর পাটনা থেকে পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিল। কারণ এখানে থেকে আন্দোলন পরিচালনা করা গেলেও প্রত্যক্ষ জিহাদ পরিচালনা অসুবিধাজনক। এছাড়া উপমহাদেশের সীমান্ত অঞ্চল ছাড়া এদিকে আর কোন স্বাধীন এলাকা না থাকায় কেন্দ্র পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সীমান্ত অঞ্চল ছাড়া উপমহাদেশের আর কোন এলাকা সৈয়দ সাহেবের পছন্দ

হলো না। কারণ সীমান্ত অঞ্চলের সম্পূর্ণ এলাকা মুসলিম অধ্যুষিত ছিল। এলাকার জনসাধারণ যুদ্ধ বিদ্যায় ছিল পারদর্শী। তাদের একাগ্র সহযোগিতার আশায় সেখানে কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। সত্যিকার অর্থে সীমান্তের অধিবাসীরা যদি সৈয়দ সাহেবকে একাগ্রচিত্তে সহযোগিতা করতো, তাহলে পাঞ্জাব থেকে শিখদের বিতাড়িত করা ছিল খুবই সহজ, পাঞ্জাব দখলে এলে উপমহাদেশকে শত্রুমুক্ত করার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হতো। এ সময় সীমান্তবাসীরা শিখদের অত্যাচার নিপীড়নের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছিল। তাই অতি সহজে তাদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা যাবে বলে চিন্তা করা হয়েছে।

অতএব যারা পূর্বেই পরাধীন হয়ে গেছে, তাদের চেয়ে এদেরকে স্বাধীন রাখা অধিক প্রয়োজন ছিল। সীমান্তের উত্তর-পশ্চিমের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত মুসলমান অধিবাসী ছিল, প্রয়োজনে তাদের সাহায্য পাওয়ার আশা ছিল। সাহায্য না করলেও বিরোধিতার কোন আশঙ্কা ছিল না। সীমান্তের যে এলাকাকে কেন্দ্র করা হয়েছিল, ভৌগলিক অবস্থানের কারণে শুধুমাত্র একদিক থেকেই শত্রুর আক্রমণের সুযোগ ছিল। এছাড়া বাকী অন্য কোন দিক থেকে আক্রমণের কোন সুবিধা ছিল না। অপরদিকে সৈয়দ সাহেব পাঞ্জাব অভিযানে অগ্রসর হলে মুসলমান ছাড়াও নিপীড়িত হিন্দু সম্প্রদায়ও স্বাগত জানাতো। ডান দিকের ভাওয়ালপুর, সিন্ধু এবং বেলুচ সরকারের পক্ষ থেকেও সাহায্যের আশা ছিল। এসব অনুকূল পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে সীমান্তকে আন্দোলন এবং জিহাদের কেন্দ্র হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল। কিন্তু সীমান্তবাসীদের শেষ পর্যায়ের মোনাফেকীর কারণে সমস্ত সাধণা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এরপরও সাধারণ জ্ঞানে সৈয়দ সাহেবের সিদ্ধান্ত সার্বোতভাবে যুক্তিসংগত, মজবুত এবং সঠিক ছিল।

জিহাদের উদ্দেশ্যে হিজরত

একাধারে দশ মাস সকল দিকের প্রচার, জনসংযোগ এবং প্রস্তুতি গ্রহণের পর ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী সোমবার সৈয়দ সাহেব হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। জীবনের চল্লিশটি বছর যে অঞ্চলে কাটিয়েছেন, সেখানকার প্রতিটি অলিগলির সাথে স্থাপিত ছিল অন্তরের সম্পর্ক, সকল আত্মীয় স্বজনের মায়া মমতা পরিত্যাগ করে ফরজ জিহাদ আদায়ের উদ্দেশ্যে সৈয়দ সাহেব পা বাড়ালেন। পিতা-মাতার মহব্বত, সন্তান-সন্ততির স্নেহ, বাড়ী-ঘর, ধন-সম্পদের মায়া, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের মমতা কি স্বেচছায় পরিত্যাগ করা যায়? হ্যাঁ মর্দে মোমিন মুজাহিদের পক্ষে এটা সম্ভব, কারণ তাঁরা এ সব কিছুর উর্ধ্বে আল্লাহ্‌র ভালোবাসাকে স্থান দেয়। সত্যের পথের সৈনিকরা সবসময় এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। কোন প্রতিবন্ধকতা তাদের চলার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। পীর-মুরিদী এবং নযর নেওয়াজের মত আরাম আয়েশের পথ সৈয়দ সাহেবের জন্য ছিল উন্মুক্ত। কিন্তু তাঁর সামনে ছিল মহান প্রভুর সেই বাণী-

"(হে নবী) আপনি বলে দিন, তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের ধন-সম্পদ -যা তোমরা (কষ্ট করে) উপার্জন করেছ, তোমাদের ব্যবসা-বানিজ্য -যার ক্ষতিগ্রস্থতাকে তোমরা ভয় পাও, তোমাদের আকর্ষনীয় আবাসিক ভবন, সব কিছুকে কি তোমরা আল্লাহ্‌, তাঁর রাসূল এবং জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক ভালোবাসো? তাহলে সে সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর, যখন আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত এসে হাজির হবে।" (সূরা তওবা)

তাই সৈয়দ সাহেব তাঁর প্রিয় সব কিছুকে পিছনে ফেলে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহর পথে রওয়ানা

হলেন। তিনি তাঁর গ্রামের সীমানা নির্ধারিনী নদী পার হয়ে দু'রাকাত শোকরানা নামাজ আদায় করলেন এই কারণে যে, সবকিছু পরিত্যাগ করে জিহাদের জন্য বের হবার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাঁকে সুযোগ দিয়েছেন। হেকমতগত কারণে তিনি সঙ্গী মুজাহিদদেরকে চারভাগে ভাগ করে দু'একদিন পরপর এক একদল রওয়ানা করার নির্দেশ দিয়ে নিজে একটি দল নিয়ে প্রথমে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এরপর থেকেই আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে মুজাহিদ সীমান্তের দিকে যাত্রা শুরু করে। সফরের সময় বিভিন্ন স্থানে রাত্রি যাপন করলে মুজাহিদদের পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা হতো। প্রত্যেক রাতের জন্য গোপন কোন শব্দ নির্ধারণ করে মুজাহিদদের জানিয়ে দেয়া হতো। পাহারাদারের প্রশ্নের জবাবে রাতের অন্ধকারে ঐ শব্দটি হতো পরস্পরের পরিচয়ের মাধ্যম। আধুনিক যুদ্ধশাস্ত্রে যাকে "কোডওয়ার্ড" আখ্যায়িত করা হয়।

সৈয়দ সাহেব রায়বেরেলী থেকে জিহাদের জন্যে রওয়ানা হওয়ার দশমাসের মধ্যে প্রায় তিন হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেন। রায়বেরেলী থেকে বুন্দেলখন্ড, গোয়ালিয়র, টোঙ্ক, রাজপুতনা, সিন্ধু, বেলুচিস্তানের মরুভূমি, বিপদ সঙ্কুল পাহাড়-পর্বত এবং পানাহারের ভীষণ কষ্ট অতিক্রম করে পেশওয়ার হয়ে চরসাদ্দায় পৌছান। উপমহাদেশের ইতিহাসে দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য এমন ত্যাগ আর কষ্ট স্বীকার করার দ্বিতীয় উদাহরণ বিরল। যেমন ছিলে ধৈর্যশীল নেতা, তেমনি কর্মী বাহিনী। সৈয়দ সাহেব এমনি একটি বজ্রকঠিন, ঐক্যবদ্ধ, সুশৃংখল, স্বার্থত্যাগী দল তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সীমান্তে পৌঁছার পর শিখদের সাথে ছোট খাট কয়েকটি যুদ্ধ সংগঠিত হয়।

অতঃপর জিহাদের আমীর নির্বাচনের প্রশ্ন উঠলে হান্ডের পুকুর পাড়ে আন্দোলনের উচচপর্যায়ের দায়িত্বশীল এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দের এক যৌথ সভায় ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী সৈয়দ সাহেবকে আমীর নির্বাচিত করা হয়। পরদিন জুমার খোতবায় সৈয়দ সাহেবের নাম সংযোজন করা হয়।

শিখ নির্যাতনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম

সীমান্তের মুসলিম জনবসতির উপর শিখদের অত্যাচার বৃদ্ধি পাওয়ায় সৈয়দ সর্বপ্রথম ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে শিখদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেন। শিখদের জুলুমবাজী যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে, এমনকি তারা যখন মসজিদে আযান দেয়া বন্ধ করে দেয়, গরু জবাইকে করে বেআইনী, ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহ্মদ কয়েক হাজার ঈমানদার মুসলমান মুজাহিদ নিয়ে শিখদেরকে আক্রমণ করেন। জালিম শিখ শক্তির বিরুদ্ধে এই জিহাদে মুজাহিদ বাহিনীর ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। এই জিহাদে কেবল বাংলাদেশ থেকেই ১২ হাজার মুজাহিদ অংশ গ্রহণ করে। সশস্ত্র সংগ্রামে মুজাহিদদের সামনে দু'টি ফলাফল অবশ্যম্ভাবী ছিল।

এক. বিজয়ী হয়ে বেঁচে থাকলে গাজী,

দুই. বিজিত হয়ে মারা গেলে শহীদ।

যুগে যুগে মুসলমানরা এই মূলমন্ত্রের কারণেই নিজেদের জান-মাল কোরবান করে খোদার পথে লড়বার জন্য প্রস্তুত হতে পেরেছিল। সৈয়দ আহ্মদের ইসলামী আন্দোলনও একই মূলমন্ত্রে পরিচালিত

হচ্ছিল। মুসলমানদের শিবির ছিল পাহাড়ী এলাকায়। আর শিখরা ছিল সমতল অঞ্চলে। মাঝে মধ্যে আক্রমণ পরিচালনা করে মুজাহিদরা শিবিরে ফিরে আসতো নিরাপদে। উইলিয়াম হান্টারের বর্ণনা অনুযায়ী "শিখরা সমতল ভূমি ছেড়ে পাহাড়ী এলাকায় মুসলমানদের শিবির আক্রমণ করার সাহস পেতনা।" ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহ্‌মদ এক প্রবল আক্রমণের মাধ্যমে শিখদের উপর বিজয় লাভ করেন। ১৮৩০ সালের জুন মাসে জেনারেল অলার্ড ও হরিশিং নালওয়ার শিখ বাহিনীর নিকট একবার পরাজিত হয়েও মুজাহিদ সৈন্যরা অকুতোভয়ে পুনরায় সমতল ভূমি দখল করে এবং সে বছরেই পেশওয়ার তাদের হস্তগত হয়।

সীমান্তে মুজাহিদ প্রেরণের ব্যবস্থাপনা

বৃটিশ, শিখ, হিন্দু, একই সাথে এ তিন শক্তির মোকাবিলায় জেহাদী বাহিনী সংগঠিত হতে লাগলো। আঞ্চলিক প্রতিনিধিরা উপমহাদেশের প্রতিটি শহরে আন্দোলনের সর্বশেষ খবরাখবর কর্মী, সমর্থক ও শুভাকাংখীদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতেন। সারা উপমহাদেশ বিশেষ করে বাংলাদেশ অঞ্চল থেকে ব্যাপক হারে টাকা পয়সা সংগ্রহ হতে লাগলো আর দলে দলে মুজাহিদরা জেহাদী অঞ্চলে জড় হতে শুরু করে। সিন্ধু নদ থেকে বহু ভিতরের দিকে সিত্তানায় মুজাহিদরা হাজির হতে হতে স্থানীয় অধিবাসীরাও আন্দোলনে যোগদান করতে লাগলো। মুজাহিদদের ক্রমাগত অগ্রগতিতে বৃটিশ শক্তি শঙ্কা বোধ করে এবং উক্ত অঞ্চলে পুলিশী তৎপরতা বৃদ্ধি করে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুজাহিদগণ আত্মগোপন করতে থাকে এবং সিত্তানার

পাহাড়ী অঞ্চলে জমায়েত হতে থাকে। অপর দিকে সোয়াত উপত্যকায়ও জেহাদী বসতি স্থাপিত হতে থাকে। এ সময় উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। তারা নিজ নিজ অঞ্চলে ব্যাপক সফর শুরু করেন এবং মুজাহিদদেরকে জিহাদী অঞ্চলে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সীমান্ত পর্যন্ত কোন অসুবিধা ছাড়াই মুজাহিদদের পৌঁছানোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এনায়েত উল্লাহ্ খান, আবদুল্লাহ্ এবং নঈম খানকে সদস্য করে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি এ কাজে নিয়োজিত ছিল। মুজাহিদদের যাত্রা পথে বিভিন্ন স্থানে বিশ্রাম-থাকা-খাওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ছিল এই কমিটির তত্ত্বাবধানে। এছাড়া পথে মুজাহিদদের গতিবিধির ব্যাপারে খুবই গোপনীয়তা রক্ষা করা হতো। সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয় কাগজ পত্র বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছানো এবং সারা দেশ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে জিহাদী অঞ্চলে পৌঁছানোর জন্য মাওলানা বেলায়েত আলী আযিমাবাদী, মাওলানা এনায়েত আলী আযিমাবাদী, মাওলানা কাসেম পানিপথি, মাওলানা সৈয়দ আওলাদ হাসান, সৈয়দ হামিদ উদ্দীন, মিয়া দ্বীন মুহাম্মদ ও পীর মুহাম্মদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে দায়িত্ব দেয়া হয়। মুজাহিদদের মধ্যে কয়েক শ্রেণীর লোক ছিল। প্রথমতঃ আন্দোলনের সাথে সরাসরি সম্পর্ক রাখার কারণে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্তরা, দ্বিতীয়তঃ জিহাদে উৎসাহ প্রদানকারীগণ, তৃতীয়তঃ খ্রীষ্টানদের অধীনে নির্বিঘ্নে থাকা আদর্শবিরোধী বলে অনুভবকারীরা। আন্দোলনের যে সমস্ত কর্মী সরকারী চাকুরীতে ছিলেন, বেতনের একটা নির্দিষ্ট অংশ প্রতিমাসে

নিয়মিত জিহাদী বসতিতে প্রেরণ করতেন। এদের মধ্যে যাঁরা আপেক্ষাকৃত সাহসী ছিলেন, সংগঠনের প্রয়োজনে মাঝে মাঝে চাকুরী থেকে ছুটি নিয়ে আন্দোলনের কাজে সময় ব্যয় করতেন। এ ব্যাপারে উইলিয়াম হান্টার তার "দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্" গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "মুসলমান পেয়াদারা ১৮৩০ সাল থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত মাঝে মাঝে বেশ কয়েক মাসের ছুটি নিয়েছে আন্দোলনের কাজের জন্য। ত্যাগতিতিক্ষা ও সাহসের এক অভূতপূর্ব নজীর স্থাপন করেছিল এই ত্বরীকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলনের কর্মীরা।"

ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন

পেশওয়ার থেকে পাঞ্জতার আসার পর স্থানীয় সর্দারগণ সৈয়দ সাহেবকে অভ্যর্থনা জানান এবং তাঁর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। পাঞ্জতার ও তার পার্শ্ববর্তী বিরাট এলাকায় মুসলিম জনবসতি ছিল। সৈয়দ সাহেব বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে সর্দারিদেরকে সাধারণ বাইয়াত না করিয়ে শরীয়তের বাইয়াত করালেন এবং বললেন, এ এলাকার সব অধিবাসী মুসলমান। এখানে নির্বিঘ্নে শরীয়তের হুকুম চালু করা যায়। আপনারা যদি এ এলাকায় শরীয়তের আইন চালু করেন, তাহলে আমি এখানে থাকবো। আর না হয় অন্যত্র চলে যাবো। সৈয়দ সাহেবের এই শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১২৪৪ হিজরীর পহেলা শা'বান পাঞ্জতারে আলেম ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের এক সভা আহবান করা হয়। সভায় সীমান্তের খান ও আমীরগণ ছাড়াও প্রায় দু'হাজার আলেম উপস্থিত হন। যীদার আশরাফ খান এবং হান্ডের খাবে খাঁনও এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। অত্র এলাকায় শরীয়তের আইন

চালু করার ব্যাপারে এ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জুমার নামাজের পর সকল খান, আমীর ও আলেমগণ সৈয়দ সাহেবের নিকট শরীয়তের বাইয়াত গ্রহণ করেন। বাইয়াত গ্রহণের সময় লিখিত শপথ নামা পাঠ করানো হয়। শপথ নামায় ছিলঃ (১) শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলার প্রতিশ্রুতিতে স্বেচছায় সৈয়দ সাহেবকে ঈমাম মনোনীত করে তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলাম। (২) এ এলাকায় শরীয়ত বিরোধী কাজ বন্ধ করে শরীয়তের হুকুম প্রতিষ্ঠা করবো। (৩) ঈমাম মনোনীত করার পর তার বিরোধিতা করা সাংঘাতিক অপরাধ। বিরোধিতার সীমা অতিক্রম করলে তার মোকাবিলায় অস্ত্র ধারণ সকল মুসলমানের উপর ফরজ। এতে শরীয়ত প্রতিষ্ঠাকারী কেউ মারা গেলে শহীদ, শরীয়তবিরোধী কেউ মারা গেলে পাপী এবং দোযখী বলে গণ্য করা হবে। (৪) ইতোপূর্বেও আমরা বাইয়াত গ্রহণ করেছি। আজ আলেমদের সম্মুখে নতুন করে বাইয়াত গ্রহণ করলাম। সৈয়দ সাহেব আমাদের জন্য দোয়া করবেন, যেন আমাদের মরা-বাঁচা শুধুমাত্র ইসলামের জন্য হয়।

এই ঐতিহাসিক বাইয়াতের পর সীমান্তের বিরাট এলাকায় ইসলামী শরীয়ত চালু হয়। ক্ষুদ্র একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যার নেতৃত্বে ছিলেন সৈয়দ আহ্মদ ব্রেলভী। শরীয়তের বিধান চালু হবার পর পুরো এলাকায় শান্তি স্থাপিত হলো। একের উপর অপরের জুলম বন্ধ হলো। জুলুম করে পলায়নের পথ বন্ধ হলো। কাজী নিযুক্ত করে বিচার ফায়সালা শুরু হলো। উৎপাদিত ফসলের একদশমাংশ (ওশর) আদায়ের ব্যবস্থা করা হলো। খারায ও যাকাত আদায় এবং বন্টনের জন্য ব্যবস্থা গৃহীত হলো। এই ভাবে সংক্ষিপ্ত

সময়ের জন্য হলেও এই উপমহাদেশের এক কোনে একটি ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উইলিয়াম হান্টার এই ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্রটিকে "জেহাদী বসতি" বলে আখ্যায়িত করেছেন।

পাঞ্জতারকে নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে গণ্য করা হলো। এই স্থানটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী খুবই নিরাপদ স্থান। একটি খালের পূর্বতীরে অবস্থিত। পাঞ্জপীর, যীদা হয়ে খালটি হান্ডের মধ্য দিয়ে সিন্ধু নদে পতিত হয়েছে। পাঞ্জতারের দক্ষিণ ও পূর্ব দিক সমতল ভূমি। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে "বাগে দেওয়ান শাহ" নামের একটি বাগান ছিল। এরই পাশে কবরস্থান। অবশ্য এখন এসব কিছুই নেই। রাজধানীর আধামাইল উত্তরে খালের পশ্চিম পাড়ের একটি টিলায় কামান বসানো হয়। রাজধানীর পূর্ব পাশে একটি বিরাট গাছ ছিল, এখানে ঈদ ও জুমার নামাজ আদায় করা হতো। শরীয়তের বাইয়াতের সভা এ স্থানেই অনুষ্ঠিত হয়। এর পার্শ্ববর্তী জমি বালুকাময়। গিরিপথের চার-পাঁচ মাইল দক্ষিণে পাঞ্জতার, আসা যাওয়ার পথ খালের তীর সংলগ্ন। দক্ষিণে খলিকালাই-এর সম্মুখে একটি টিলা আছে। এখানে কামান বসিয়েই ইংরেজগণ পাঞ্জতারকে ধ্বংস করেছিল। এর কিছু পশ্চিমে রাণীকোর্ট নামে আর একটি টিলা আছে। এখান থেকে রাজধানীর প্রতিটি ঘর বাড়ী পরিস্কার ভাবে দেখা যেতো। মুজাহিদদের মধ্যে যাদের থাকার ঘর ছিল না, তাদের জন্য পরবর্তী সময়ে সৈয়দ সাহেব একটি বস্তি তৈরী করেছেন এবং এখানে একটি মসজিদও নির্মাণ করেন। সেই আবাদী এবং মসজিদের চিত্র আজও বিদ্যমান আছে। আবাদীর চারিদিকে পাথরের প্রাচীর ছিল। প্রাচীরের চার কোনায় চারটি বুরুজ ছিল। প্রাচীরের দরজা ছিল পূর্ব দিকে। প্রথম

অবস্থায় সৈয়দ সাহেব উত্তর-পূর্ব দিকের বুরুজে অবস্থান করতেন। প্রয়োজনীয় লোকের একটি দল তার সাথে থাকতো।

এই বুরুজের সম্মুখস্থ খোলাস্থানে একা একটি ঘর ছিল। এই ঘরেই সৈয়দ সাহেব আগত লোকদেরকে সাক্ষাৎ দান করতেন, এবং প্রয়োজন বোধে মজলিশে শুরার বৈঠক বসতো। ক্রমান্বয়ে গাজীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকায় রাজধানীর পার্শ্ববর্তী স্থানে একটি আবাসিক এলাকা গড়ে তোলা হয়। গম পিষানোর জন্য এক বৃহদাকার কারখানা স্থাপন করা হয়। আবাসিক এলাকা ও কারখানা তৈরীর সময় সকলে মিলে মিশে কাজ করেন, এমনকি সৈয়দ সাহেব নিজেও একজন সাধারণ গাজীর ন্যায় কাজ করতেন। একারণেই গাজীরাও শরীয়ত সম্মত যে কোন ধরণের কাজ করতে বিব্রত বা লজ্জা বোধ করতেন না। খাবার বিলি-বন্টনে সুষ্ঠু বিধানের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু ছিল। সৈয়দ সাহেব নিজেও একই ব্যবস্থার অধীনে রেশন পেতেন।

আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের এক বৈঠকে সৈয়দ সাহেব শারীরিক এবং সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য একজন বিভাগীয় দায়িত্বশীল নিয়োগের ইচছা ব্যক্ত করায় সকলেই সম্মত হলেন। সর্বসম্মতিক্রমে হামিদ আলী খান লাহোরীকে এ বিভাগের দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হয়। তিনি ছিলেন যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী, অভিজ্ঞ, সতর্কবান এবং সাহসী। বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সৈয়দ সাহেব কখনো কখনো রাষ্ট্রীয় নির্দেশনামা জারী করেছেন। কোন জরুরী বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হলে অথবা কোন এলাকার আমীরের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হলে বা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতিকর কর্মতৎপরতার ব্যাপারে এসব "নির্দেশ নামা" জারী করা হতো। একদিন কোন এক ব্যাপারে সৈয়দ

সাহেব রাগান্বিত হয়ে অসাবধানতাবশতঃ জনৈক গাজীকে "মরদূদ" বলে ফেলেন। সাথে সাথে এ ব্যাপারে কেউ কোন কথা বললেন না। এ ঘটনার সময়ে উপস্থিত ব্যক্তিগণ রাতে এশার নামাজের পর সৈয়দ সাহেবকে তাঁর এই ক্রটির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, কোন মুসলমানকে এমন কথা বলা উচিৎ নয়। আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে। সাথে সাথেই তিনি সংশ্লিষ্ট গাজীকে ডেকে পাশে বসান এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করেন।

আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

সুলতান মুহাম্মদ খানের শাসনের পর খাইবার থেকে আম্ব পর্যন্ত সমস্ত এলাকা সৈয়দ সাহেবের আয়ত্তে এসেছিল। ইসলামী রাষ্ট্রের শত্রু বলতে এতদঞ্চলে আর কেউ ছিলনা। এবার একটা বিরাট বাহিনী গঠন করে প্রথমে শিখদের বিরুদ্ধে পরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ এবং সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে স্থানীয় সর্দার-মোল্লাদের সন্দেহ প্রবণতা, স্বার্থপরতা এবং অন্যায় পক্ষপাতিত্বের ফলে এই আশার আলো দেখতে দেখতেই নিভে গেল। তিন-চার বছরের কঠোর পরিশ্রমের পর যে ইপ্সীত চরম লক্ষ্যে পৌঁছার পথ উন্মুক্ত হয়ে এসেছিল, তা বরবাদ হয়ে গেল। উপমহাদেশের মুসলিম শাসন অবসানের পর ইসলামী আন্দোলনের উদ্দেশ্যে যে সম্পদ সমবেত করা হলো, ইউসুফ জাইর প্রান্তরে তা ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে গেলো। বহু গাজী সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অবস্থায় জীবন বিসর্জন দিলেন। সৈয়দ সাহেব চার বছরের কেন্দ্র পরিবর্তন করে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হলেন।

অত্র এলাকায় সৈয়দ সাহেবের আগমনের পূর্বে স্থানীয় মোল্লাগণ জনসাধারণের নিকট থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে সেটাকেই নিজেদের আয়ের উৎস হিসেবে ব্যবহার করতো। সৈয়দ সাহেবের আগমনের পর "ওশর" ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মোল্লাদেরকে চাঁদা দেয়ার নিয়ম বাতিল হয়ে গেল। এ কারণে তারা ভিতরে ভিতরে নিজেদের স্বার্থে সৈয়দ সাহেবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠিত হবার পর স্থানীয় সরদারদেরও বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। কারণ তখন আর তাদের ইচছামত জনসাধারণকে শাসন এবং শোষণ করা সম্ভব ছিল না। এখানে বিদেশী অর্থাৎ সৈয়দ সাহেবের জারীকৃত আইনের বাধনে তাদের চলতে হতো। এ অবস্থা তারা বেশীদিন সইতে পারলো না। ভিতরে ভিতরে সর্দারগণ সৈয়দ সাহেবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে লাগলো। মোল্লা এবং সর্দারদের ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত একই সূত্রে মিলিত হয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ শুরু হলো। গোপনে বিভিন্ন এলাকায় লোক প্রেরণ করে, ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে এবং চিঠিপত্র দিয়ে ক্রমে ক্রমে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হলো। বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নভাবে অবস্থানরত গাজীদেরকে একই সাথে হত্যা করার চক্রান্ত হলো। ইংরেজ ও শিখদের সাথে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করা হলো। সৈয়দ সাহেবকে ইংরেজদের 'চর' হিসেবে কাজ করার জন্য সীমান্ত এলাকায় পাঠানো হয়েছে বলে প্রচার করা হলো। প্রমাণস্বরূপ ইংরেজদের পক্ষ থেকে একটি ভুয়া চিঠি সীমান্তের সর্দারদের হাতে পৌঁছানো হলো। এই চিঠির ভিত্তিতে মোল্লারা জনসাধারণের নিকট প্রচার করলো যে, সৈয়দ সাহেবের সমর্থন করাতো দূরের কথা, তাঁর বিরোধিতা করাই হচেছ ইসলামের

বড় খেদমত। এ ছাড়া স্থানীয় সর্দারগণ একটি যুবতীর কান কেটে তাকে অনাবৃত মাথায় ফরিয়াদিনী হিসাবে সৈয়দ সাহেবের বিচারের উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য প্রেরণ করা হয়। মোটকথা বিভিন্ন দল বিভিন্ন স্বার্থে এখানে মিলিত হয়। স্থানীয় মোল্লাগণ আগের মত নিজেদের উপার্জনের পথ খোলাসা করার চিন্তায় ব্যস্ত ছিল। সর্দারগণ নিজেদের শাসন শোষণের পথ উন্মুক্ত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। জনসাধারণ সর্দার ও মোল্লাদের প্রভাবে তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল।

শিখ ও ইংরেজগণ এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ইসলামী আন্দোলনের পৃষ্ঠে কুঠারাঘাত করার সিদ্ধান্ত নিল। সৈয়দ সাহেব ও তাঁর সাথীগণ এ ব্যাপারে পূর্বাভাস পেয়েও পরিস্থিতির বাস্তবতা আঁচ করতে পারেননি। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানরত গাজীদেরকে এই বিশ্বাসঘাতকের দল নির্মমভাবে হত্যা করে। কাউকে ঘুমের মধ্যে, কাউকে নামাজ পড়া অবস্থায়, কাউকে পথ চলতে, কাউকে গল্পের আসরে হত্যা করা হয়। লুট করা হয় বিভিন্নস্থানে রক্ষিত ইসলামী রাষ্ট্রে খাদ্য গুদামসমূহ। ক্ষমতা লাভের জন্য মুসলমানেরা পরস্পর যে রক্ত ক্ষয় করেছে, ইসলামের ইতিহাসে আজও সে রক্তের দাগ মুছে যায়নি। কিন্তু পেশওয়ার এবং সীমান্তের ক্ষমতালোভী সর্দারগণ স্বার্থলিপ্সু মোল্লাগণ এবং এদের হাতের ক্রীড়নক স্থানীয় জনসাধারণ গাজীদের বিরুদ্ধে যে হীন ষড়যন্ত্র করেছিল, তা স্মরণ করলে আজও হৃদয় কেঁপে ওঠে। পরিতাপের বিষয় যে, এরা সবাই নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করতেন। উপমহাদেশকে

শত্রুমুক্ত করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমানদের স্বাধীনতা রক্ষা এবং সাধারণ মানুষের মুখে হাঁসি ফুটাবার একাগ্র বাসনা নিয়ে যারা নিজেদের সুখ-শান্তি, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করে হাজার হাজার মাইল দূরে হিজরত করে এসেছিলেন, সেই মুসলমানরাই তাঁদের শিরোচেছদ করে উৎসব করেছিল। এর চেয়ে হৃদয়বিদারক, মর্মান্তিক, নৃশংসতা আর কি হতে পারে? গাজীদেরকে যে করুন অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে এর বিস্তারিত বিবরণ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় দেয়া সম্ভব নয়। শুধু এখানে এতটুকুই লিখলাম, কয়েকজন গাজীকে হাজার হাজার মানুষ কুকুর-বিড়ালের মত পিটিয়ে, কুপিয়ে, বর্শা দিয়ে খুঁজিয়ে হত্যা করেছে। এমনকি এই পাষন্ডরা শহীদদে লাশে পদাঘাত করে বলেছে, "ওঠ! নামাজ আদায়ের জন্য তাকীদ কর, ওশর আদায় কর।"

এই করুণ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে জিহাদের কেন্দ্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত হলো এবং সৈয়দ সাহেব ঘোষণা করলেন, "যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁরা সবাই শহীদ। আমি আমার জীবন আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে রেখেছি। সামনে আরো অধিক বিপদ মুসিবত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমি সেদিকেই অগ্রসর হতে যাচ্ছি। যাঁরা এই অনাগত বিপদ মুসবতকে ভয় পান, তারা যেন নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে যান।" গাজীগণ একথা শুনে সকলেই কাঁদতে লাগলেন। প্রিয় ঈমামকে জিহাদের ময়দানে একা ছেড়ে যেতে কেউ রাজী হলেন না। এরপর সৈয়দ সাহেব নেজের স্ত্রীদ্বয়কে অছিয়ত করেন, "আমার জীবন যদি এই এবাদতেই শেষ হয়ে যায়, তবে তোমরা অন্য কোথাও বসতি

স্থাপন না করে মক্কা অথবা মদীনা শরীফে চলে যাবে। কেননা এই ফেত্‌না-ফাসাদের যুগে এ ছাড়া অন্য কোথাও ঈমান বাঁচিয়ে রাখা দায়। কষ্ট হলেও সেখানে বসত করা শ্রেয়।"

দ্বিতীয় হিজরত

দ্বিতীয় হিজরতের পূর্বে শেষবারের মত সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী পাঞ্জতারের লোকদের ডেকে কয়েকটি উপদেশ দিলেন। "ফতেহ্ খান তোমাদের নেতা, তাঁকে ওশর দিবে। শরীয়তের নির্দেশ মেনে চলবে। ভারত থেকে আগত মুজাহিদদেরকে যত্ন করবে এবং নিরাপদে আমার নিকট পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে।" এরপর সৈয়দ আহমদ জিহাদের নতুন কেন্দ্রের সন্ধানে চার বছরের ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্র পরিত্যাগ করে হিজরত পর কাফেলা নদী অতিক্রম করে। এখান থেকে পিওয়ার পাহাড়ের খাড়াই আরম্ভ হয়। খুবই দুর্গম পথ। ঘোড়া-উট পা পিছলিয়ে পড়ে যাচ্ছে। পদাতিকগণ খুব কষ্টে পথ অতিক্রম করছিলেন। কর্ণায় শিবির স্থাপিত হলো। বিশ্রামের পর কাফেলা সিন্ধু নদের তীরে কাচুল গ্রামে পৌছালো। সিন্ধু নদ পার হতে তিনদিন সময় লাগলো। নদী পার হয়ে কাফেলা তাকুটে অবস্থান করে। আরো অগ্রসর হয়ে রাজদেউরীকে নতুন কেন্দ্র হিসেবে মনোনীত করা হয়। রাজদেউরী পাখলীর সমস্ত গিরী পথের মুখে থাকায় এটা কেন্দ্রের মর্যাদা পাবার অধিকারী ছিল। এখানে গম ভাঙ্গানো এবং লাকড়ী সংগ্রহ করা খুবই সুবিধাজনক ছিল। রাজদেউরী সকল খানদের যৌথ সম্পত্তি ছিল, এখানে অবস্থান করলে কোন খানেরই অসন্তুষ্ট হবার কারণ ছিল না। সৈয়দ সাহেব এখানে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং গাজীদেরকে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায়

অবস্থান নেয়ার জন্য ভাগ ভাগ করে পাঠিয়ে দিলেন। মুজাহিদগণ নিষ্ঠুরভাবে শহীদ হবার পর সৈয়দ সাহেব পাঞ্জতার পরিত্যাগ করে রাজদেউরী পৌঁছালে চারদিকে প্রচার হয়ে যায় যে, সৈয়দ বাদশাহ কাশ্মীর আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হচেছন। অবশ্য এর পিছনে কারণও ছিল। সৈয়দ সাহেব রাজদেউরী পৌঁছতে পৌঁছতে মুজাহিদদের অগ্রগামী দল ভোগরমঙ্গ এবং বালাকোট ছাড়াও কাশ্মীরের নিকটবর্তী শহর মুযাফফরাবাদে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। পরিস্কার মনে হচ্ছে যে, তারা কাশ্মীর প্রবেশ করবেন। এই সংবাদ পেয়ে রনজিত সিংহ তার পুত্র হরি সিংহকে সেনাপতি করে বিরাট বাহিনী সাথে দিয়ে হাযারা প্রেরণ করে। শ্যাম সিংহ এবং জাওয়াল সিংহকেও সাথে পাঠানো হলো। এরা সকলেই ছিল শিখ দরবারের অন্যতম সদস্য। যে কোনভাবেই হোক, সৈয়দ সাহেবকে কাশ্মীর প্রবেশে বাধা দেয়াই ছিল এদের প্রধান দায়িত্ব। শের সিংহ তার বাহিনী নিয়ে শানকিয়ারী পৌঁছালো। মুজাহিদ বাহিনীর সুদৃঢ় অবস্থানের কারণে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী শানাকিয়ার দূর্গ থেকে শিখ সৈন্যরা বের হবার সাহস পায়নি। এতে অত্র উপত্যকার অধিবাসীরা খুবই খুশী হয় এবং সানন্দে ওশর এনে সৈয়দ সাহেবের সামনে হাজির করে। এখানে আসার পর মুজাহিদগণ চারটি শর্তের ভিত্তিতে নতুন করে শপথ গ্রহণ করেন। শর্তগুলো হচেছ (১) কোন প্রকার অভাব-অভিযোগই আল্লাহ্ ছাড়া আর কারুর নিকট প্রকাশ না করা (২) যা নিজের জন্য অপছন্দনীয়, অন্য মুসলিম ভাইয়ের জন্যও তা অপছন্দনীয় মনে করা। নিজের পছন্দনীয় বস্তু অন্যের জন্য পছন্দ করা। (৩) নিজের অভাব-অভিযোগের চেয়ে অন্যের অভাব-অভিযোগকে গুরুত্ব দেয়া। (৪) প্রত্যেকটি কাজ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা।

বালাকোট যুদ্ধ ও ঈমাম সাহেবের শাহাদাত

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে কাগান ও কাশ্মীরের কয়েকজন মুসলমান সর্দার শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরে এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য তাঁরা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর নিকট আবেদন জানান। মুসলমান ভাইদের সাহায্যের ডাকে সাড়া দিয়ে সৈয়দ সাহেব মুজাহিদ বাহিনীকে তৈরী হবার নির্দেশ দেন। সোজা পথে প্রতিবন্ধকতা থাকায় সৈয়দ সাহেব তাঁর বাহিনী নিয়ে এক দুর্গম পথে কাশ্মীর রওয়ানা হন। শীতের তীব্রতা এবং পথ বন্ধুর হওয়ায় দীর্ঘদিন পর মুজাহিদ বাহিনী ঐ সনেরই এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে বালাকোট ময়দানে ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় উপস্থিত হন। এদিকে মুজাহিদ বাহিনীর অগ্রসর হবার সংবাদ পূর্বেই শিখ ছাউনীতে পৌঁছে গিয়েছিল। এতদঞ্চলের শিখ বাহিনীর সেনাপতি ছিল শের সিংহ। বালাকোট ময়দানের কাছেই মাটিকোট নামক একটি টিলা ছিল। সেখান থেকে বালাকোট আক্রমণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সুবিধাজনক ছিল। তাই পূর্ব থেকেই শের সিংহ তার বাহিনী নিয়ে মাটিকোট অবস্থান করছিল। সেখান থেকে বালাকোট অবস্থানকারীদের অবস্থা, সংখ্যা এবং গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা সুবিধাজনক ছিল। মুজাহিদ বাহিনী বালাকোটে পৌছার পর পার্শ্ববর্তী এলাকায় পাহারারত মুজাহিদ বাহিনীর কয়েকটি টহল দলের সাথে শিখ টহল দলের মধ্যে কিছু বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ হয়েছিল। এসব সংঘর্ষের প্রায় সবগুলিতেই মুজাহিদগণ বিজয় লাভ করেছেন। কিন্তু শিখ শিবিরে শিখ সৈন্যদের সংখ্যা মুজাহিদ বাহিনীর চেয়ে বহু গুণে বেশী ছিল। পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য মুজাহিদ শিবিরে শুরার বৈঠক বসল। শূরায় দু'ধরণের মতামত

এলো। এক ঃ মুজাহিদ বাহিনীকে বিশ্রাম করতে দেয়া এবং বাহিনী বৃদ্ধি করে পরে আক্রমণের উদ্দেশ্যে এখন আত্মরক্ষা করে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়া প্রয়োজন। দুই ঃ শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে শত্রুর মোকাবিলায় অগ্রসর হওয়া। এতে বিজয় লাভ করলে গাজী এবং মৃত্যুবরণ করলে শহীদ। অতএব আত্মরক্ষার চেষ্টা না করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। শেষ পর্যন্ত বৈঠকে দ্বিতীয় মতের পক্ষেরই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। জয়-পরাজয়ের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে মুজাহিদ বাহিনী যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে থাকে। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসের ৬ তারিখে সূর্যোদয় হলো। মাটিকোটের উত্তর দিকে শিখ সৈন্যদের অগ্রযাত্রা দেখা দিল। তাদের গতি বালাকোটের দিকে। ক্রমেই শিখদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুজাহিদ শিবিরে এবং পার্শ্ববর্তী মুসলিম জনবসতিতে শিখদের বন্দুকের গুলী এসে পৌঁছতে লাগলো। এ পরিস্থিতিতে খুব ভোরে ভোরে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবার নির্দেশ এলো। এমন সময় মুযাফফরাবাদের আমীর মাসুদ খানের একখানা গোপন চিঠি সৈয়দ সাহেবের হাতে পৌঁছানো হলো। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল, "যদি শিখ সৈন্যদের মোকাবিলা করতে পারবেন বলে মনে করেন, তবে সেখানেই থাকুন। অন্যথায় বারনা অথবা সতবনের খাল দিয়ে মুজাহিদ বাহিনীকে নিয়ে পাহাড়ের পিছনে চলে যান।" এর আগেও নজফ্ খান একই ধরনের আরেকটি চিঠি সৈয়দ সাহেবের নিকট পাঠিয়েছিলেন। এবার সৈয়দ সাহেব নজফ্ খানের জন্য উত্তর লিখে পাঠালেন, "আপনাদের দু'খানা পত্র আমি পেয়েছি। আপনার পরামর্শও অবগত হলাম। আমাদের প্রতি আপনার যে হক ছিল, তা আপনি

পালন করেছেন। আল্লাহ আপনাকে তার প্রতিদান দিন। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান, লোক কম-বেশীর প্রশ্ন আদৌ আমাদের সামনে নেই। শূরার সিদ্ধান্তও তাই। তাছাড়া শত্রুর ভয়ে সরে যাওয়া ইসলাম কখনো অনুমোদন করে না। আল্লাহর ইচছা এই বালাকোটেই বাস্তবে পরিণত হবে।" সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী নিজেই আজকের যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। ছোট ছোট গ্রুপ কমান্ডারদেরও প্রতি নির্দেশ হলো -সমবেত আক্রমণ হবে। সকলেই নিজ নিজ ব্যূহের মধ্যে থেকেই গুলী চালাবে। যেহেতু শত্রু সৈন্য বেশী। সেহেতু বিভিন্নদলে বিভক্ত হয়ে নয়, সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করলেই সুবিধা হবে। শিখ সৈন্যরা ক্রমে ক্রমে মুজাহিদ বাহিনীর দিকে স্রোতধারার মত অগ্রসর হতে থাকে। শিখ সৈন্যরা খুব কাছাকাছি পৌছলে ঈমাম সাহেব তকবীর ধ্বনি করে আক্রমণ করলেন এবং সকলকে আক্রমনের নির্দেশ দিলেন। মুজাহিদ বাহিনীর প্রথম আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে শিখ বাহিনী পশ্চাদপসরণ করতঃ পাহাড়ের উপর আরোহণ করতে থাকে। মুজাহিদ বাহিনী তাদের পিছু ধাওয়া করতে করতে পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে উপস্থিত হয়। শিখ সেনাপতির উৎসাহে শিখ বাহিনী আবার সামনে অগ্রসর হতে শুরু করে। ইমাম সাহেব পুনরায় বিদ্যুতবেগে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। শত্রুদের কেউ অস্ত্র ধারণ করলো, কেউ পলায়ন করলো। কিন্তু কোথায় পালাবে? তারা পাহাড় থোক স্রোতের বেগে নামছিল, অথচ দৌড়ে পাহাড়ে উঠতে পারছিল না। যারা নিচে নেমে গিয়েছিল, তাদের প্রায় সকলেই নিহত হলো। উপর থেকে শিখ সৈন্যরা গুলী করছিল, বৃষ্টির মত গুলী। উভয় পক্ষে পাথর বিনিময়ও চলছে। অবশেষে অসংখ্য শিখ সৈন্য স্রোরের মত

মুজাহিদ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে প্রচন্ড যুদ্ধ, হাতাহাতি এবং মল্ল যুদ্ধ শুরু হয়। এক একজন মুজাহিদ কোন কোন বর্ণনা মতে ১০০ শিখ সৈন্যের সাথে মোকাবিলা করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। এক পর্যায়ে দুপুর ১১টা কি ১২টা দিকে গুলীর আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মটিকোটের খালের তীরে সৈয়দ সাহেব মানে সকলের ঈমাম শাহাদাত বরণ করেন। দিনটি ছিল ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে, রোজ শুক্রবার, ১২৪৬ হিজরীর ২০শে জিলকদ।

সৈয়দ সাহেবের শাহাদাতের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে একজন মুজাহিদকেও জীবিত যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরিয়ে নেয়া যাবে না এ কথা চিন্তা করে মুজাহিদদের মধ্য থেকেই কেউ একজন দূর থেকে চিৎকার করে বললেন, "গাজীবৃন্দ, তোমরা এখানে কি করছ, আমীরুল মোমেনীনকে স্থানীয় মুসলমানগণ সতবনের পথে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচেছ।" এ শব্দ শুনে যেসব মুজাহিদ জীবিত ছিলেন, সকলের মনে আবার আশার আলো খেলে গেল। প্রাণ প্রিয় ইমামকে জীবন্ত স্বচক্ষে দেখার জন্য মরিয়া হয়ে সতবনের পথে দৌড়াতে লাগলেন মুজাহিদগণ। এতক্ষণে শিখ সৈন্যরা মুজাহিদ শিবির দলিত করে তাদের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী পার্শ্ববর্তী গ্রামে প্রবেশ করে। লুটতরাজের পর গ্রামে অগ্নি সংযোগ করে নিজেদের গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা করে। গ্রামগুলো থেকে তখন ধূঁয়া উঠছিল। তবে ঈমাম সাহেবের নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার এ ঘোষণা কে বা কারা দিয়েছিলেন অদ্যাবধি তা জানা যায়নি। বিভিন্ন বর্ণনামতে মুষ্টিমেয় মুজাহিদ বাহিনী শিখদের বিরাট রেজিমেন্টকে কমপক্ষে তিনবার পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু শত্রু পক্ষ বহু গুণে অধিক হওয়ায় শেষ পর্যন্ত

মুজাহিদদের পরাজয় বরণ করতে হয়। এই যুদ্ধের পরও প্রায় তিনশত মুজাহিদ জীবিত ছিলেন। শিখ সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করলে মুসলিম অধিবাসীগণ মুজাহিদদের লাশ দাফন করে। একই মাসের ১৮ তারিখে অর্থাৎ মাত্র ১১ দিনের ব্যবধানে ইংরেজদের কামানের মুখে বঙ্গবীর তিতুমীরের বাঁশের কিল্লা উড়ে যায় এবং তিনিও সেখানে শহীদ হন। ইংরেজদের পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রথম বাংলা ভাষাভাষী শহীদের গৌরব একমাত্র তাঁরই। লক্ষণীয় দিক হলো যে, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর ত্বরীকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলন তার শাহাদাতের পর সরাসরি বৃটিশ বিরোধী ভূমিকা পালন করে। আর বাংলাদেশের ফরায়েজী আন্দোলন এবং তিতুমীরের আন্দোলন উদ্যোক্তাদের জীবদ্দশাতেই বৃটিশবিরোধী ছিল। কিন্তু এই তিনটি আন্দোলনের মধ্যে সাংগঠনিক মজবুতী এবং ক্যাডার পদ্ধতির কারণে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর ত্বরীকায় মুহাম্মদী আন্দোলনই দীর্ঘস্থায়ী এবং সুদূর প্রসারী হয়েছিল।

আন্দোলনের পুনরুজ্জীবন

সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর শাহাদাতের পর নেতৃত্বের অভাবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁর প্রতিষ্ঠিত ত্বরীকায় মুহাম্মদী আন্দোলন মুমূর্ষ অবস্থায় ছিল। কিন্তু আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো মজবুত থাকার কারণে ধীরে ধীরে আবার সংগঠন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে। বাংলাদেশ অঞ্চলের দায়িত্বশীল মাওলানা বেলায়েত আলী এবং পাটনার দায়িত্বশীল মাওলানা এনায়েত আলী যৌথ প্রচেষ্টায় ত্বরীকায়ে মুহাম্মদী

আন্দোলন পুনরায় জীবন ফিরে পায়। ইসলামী আন্দোলনের পতাকা আবার মুক্ত বাতাসে পত পত করে উড়তে থাকে। মাওলানাদ্বয় সম্পর্কের দিক থেকে আপন ভাই ছিলেন। তাদের জ্বালাময়ী বক্তৃতা মুসলিম যুবক বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমান যুবকদেরকে পাগল করে তুলেছিল। তখনকার বাংলাদেশের মুসলমান পরিবারগুলোতে এমন কোন সমর্থ যুবক ছিল না, যারা সীমান্তের জেহাদী বসতিতে গিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেনি। ব্যাপক সফরের মাধ্যমে এই আলী ভাতৃদ্বয় উপমহাদেশের সর্বত্র সংগঠনকে পুনর্গঠিত করেন এবং পুনরায় বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য মুজাহিদ সংগ্রহ শুরু করেন। আবার দলে দলে সীমান্তের দিকে মুজাহিদদের যাত্রা শুরু হলো। সাংগঠনিক পদ্ধতিতে লোক সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ, দ্বীনি তা'লিম, জিহাদে উদ্বুদ্ধকরণ, লোক বাছাই, নেতৃত্ব সৃষ্টি, অর্থ সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মসূচী বাস্তবায়িত হতে লাগলো। আন্দোলনের তৎপরতা নতুন করে শুরু হবার সংবাদ পেয়ে বৃটিশ সরকার সংগঠনের বিরুদ্ধে পুলিশী তৎপরতা বৃদ্ধি করে। বিভিন্ন এলাকার দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার দায়ে মামলা রুজু করে। অনেকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়। বহু মুজাহিদ এবং কর্মীকে গ্রেফতার করে জেলে পুরে দেয়। সমাজের সর্বস্তরের মুসলমানগণ নামাজের জামায়াতের মত সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে জিহাদী আন্দোলনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইসলাম বিরোধী শক্তির মোকাবিলা করেছে। ষড়যন্ত্র মামলায় বাঙ্গালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী এবং সীমান্তের পাঠান মুসলমানগণ এক আদর্শের পতাকাবাহী হিসেবে নির্দ্বিধায় একই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে। এ

সময়কার কয়েকটি প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে বাঙ্গালী মুসলমানরা তাদের ঐতিহাসিক বদনাম "ভীরু বাঙ্গালী" শব্দটিকে মিথ্যা প্রমাণিত করে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে শত্রুর মোকাবিলা করেছে। আন্দোলনটিকে নির্মূল করার জন্য বৃটিশ সরকার সবসময়ই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী এবং বৃটিশ গোয়েন্দারা সবসময় এ আন্দোলনের কর্মীদের খুঁজে বেড়াতো যত্রতত্র। সংগঠনের দায়িত্বশীল এবং সক্রিয় কর্মীদের মাথার উপরে ঝুলতো সর্বদা রাষ্ট্রদ্রোহীতার খড়ক- কৃপাণ। কিন্তু এই সব কিছুর পরও কোন সময়ই বৃটিশ সরকার এ আন্দোলনকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। শিখ ও বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশ সহ সমগ্র উপমহাদেশ থেকে অসংখ্য মুসলমান আর অগণিত টাকা-পয়সা নিয়মিতভাবে বৃটিশ সরকারের দৃষ্টি এড়িয়ে অত্যন্ত সুকৌশলে সীমান্তের জেহাদী বসতিতে প্রেরিত হয়েছে। মুসলমানদেরকে জিহাদ থেকে বিরত রাখার জন্য ইংরেজ সরকার বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার পর তারা অর্থের বিনিময়ে স্বার্থান্বেষী আলেমদের ফতোয়াবাজীরও আশ্রয় নিয়েছিল। "এদেশে এ সময়ে জিহাদের অংশ গ্রহণ করা জায়েজ নয়" বলে প্রচারিত তথাকথিত আলেমদের ফতোয়াতে তৎকালীন মুসলমানেরা বিভ্রান্ত হয়নি। শহীদ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর অনুপস্থিতিতে ত্বরীকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন সমাজের শ্রেষ্ঠ আলেমগণ। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করা গেলে ইসলামকেও সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয় এই চিন্তাধারার উপরই তারা আন্দোলনের গতি

পরিচালিত করেন। রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় বৃটিশ সরকার এ আন্দোলনের কর্মীদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেও আন্দোলন থেকে বিচিছন্ন করতে পারেনি। এক ভাইয়ের কঠোর শাস্তি দেখে অপর তিন ভাই জিহাদী বসতিতে যোগান করার জন্য রওয়ানা হয়ে যাওয়ার ইতিহাস রয়েছে। ১৮৯০ সালেও সীমান্তে মুজাহিদদের ঘাঁটি ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮১৫ সালে বৃটিশ বাহিনীর সাথে সীমান্তের এক সংঘর্ষে ১২ জন কালো পোশাকধারী মুজাহিদের লাশ উদ্ধার করা হয়। এই বছরেরই ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোর, পেশওয়ার ও কোহাটের প্রায় ৫০ জন ছাত্র মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করার জন্য কাবুল চলে যায়। ১৯১৭ সালে জানুয়ারীতে রংপুর ও ঢাকার ১৮ জন মুসলমান মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। মুজাহিদ শিবিরে গোপনে টাকা নিয়ে যাওয়ার সময় এ বৎসরের মার্চ মাসে দু'জন মুসলমান ৮ হাজার টাকাসহ গ্রেফতার হন। এরা উভয়ই বহুপূর্ব থেকে ত্বরীকায় মুহাম্মদী আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। দেওবন্দ মাদ্রাসার মাওলানা ওবায়দুল্লাহর নেতৃত্বে আন্দোলনের এক দল কর্মী বিদেশে বসে দেশের ইংরেজ বিতাড়ণের জন্য সাধ্যানুযায়ী তৎপরতা চালাতেন। এ তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু চিঠি সিন্ধুর জনৈক মুজাহিদ নেতার নিকট প্রেরিত হবার সময় পথিমধ্যে তা বৃটিশ সরকারের লোকদের হাতে ধরা পড়ে। এটাকে ইংরেজ সরকার "রেশমী চিঠির ষড়যন্ত্র" নামে আখ্যায়িত করেছিল। উপরোক্ত তথ্যগুলো ইংরেজ সরকারের বিভিন্ন রেকর্ড পত্র থেকে সংগ্রহ করা। ইংরেজ সরকারের দৃষ্টির অগোচরে সংঘটিত হয়েছে, আন্দোলনের এমন অসংখ্য কাজ এখানে

উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। শুধুমাত্র যে সব তৎপরতা ইংরেজ সরকারের গোচরীভূত হয়েছে, এখানে মাত্র তার কয়েকটি তুলে ধরা হলো।

এ আন্দোলনের কর্মীদের বৈশিষ্ট সম্পর্কে "দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস" গ্রন্থে উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন, "মুহাম্মদী আন্দোলনের কর্মীরা ছিল অক্লান্ত পরিশ্রমী, ব্যক্তি স্বার্থ সম্পর্কে একেবারে অমনোযোগী, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী, বিধর্মী ইংরেজ উৎখাত করার জন্য সর্বস্বত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কর্মী, সমর্থক ও অর্থ সংগ্রহের স্থায়ী ব্যবস্থা পত্তনে অত্যন্ত সুকৌশলী এবং চরিত্রবান হিসেবে সর্বদা প্রশংসার যোগ্য।" ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতার সংগ্রামীদের সম্মুখে এ আন্দোলন প্রেরণার উজ্জ্বল প্রতীক হিসেবে ভাস্বর ছিল। শহীদ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর শাহাদাতের কয়েক বছর পর তাঁরই অনুসৃত নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করে রাশিয়ার "তাখ্‌ফায্‌" নিবাসী বিশ্ব বিখ্যাত মুজাহিদ শায়খ শামেল এমন এক মুজাহিদ সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন, যে সংগঠনের কর্মীরা রাশিয়ার অত্যাচারী জার শক্তির সাথে ২৫ বৎসর পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। সৈয়দ সাহেবের শাহাদাতের ৪০ বৎসর পর তাঁর কর্ম পদ্ধতির অনুসরণে শায়খ মুহাম্মদ সুদানী অতি অল্প সময়ের মধ্যে আদর্শিক দিক থেকে মৃত প্রায় সুদানবাসীকে ঐক্যববদ্ধ করে ইসলামী আন্দোলনের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেছিলেন। দুঃখের বিষয় আজ আমরা আমাদের এই গৌরবময় এবং ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস ভুলে গেছি। এমনকি আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদেরকেও তা ভুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে।

সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী ও তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর পর্যালোচনা

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র মৃত্যুর অর্ধশতক অতিক্রম হবার আগেই হিমালয়ান উপমহাদেশে একটি আন্দোলনের উদ্ভব হলো। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ জনগণের দৃষ্টিসমক্ষে যে লক্ষ্যবিন্দুকে উজ্জ্বল করে গিয়েছিলেন, এ আন্দোলন ছিল সেই একই লক্ষ্যের অনুসারী, সাইয়েদ সাহেবের পত্রাবলী ও বাণী এবং শাহ্ ইসমাঈল শহীদের "মাসনাবে ঈমামাত" "উকবাত" "তাকবিয়াতুল ঈমান" ও অন্যান্য রচনাবলী পাঠ করলে উভয় স্থানেই শাহ্ ওয়ালিউল্লাহরই সরব কণ্ঠ শ্রুত হবে। শাহ্ সাহেব কার্যতঃ যা করেছিলেন তা হলো এই যে, তিনি হাদীস ও কুরআনের শিক্ষা এবং নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সৎ ও সুস্থ চিন্তা সম্পন্ন লোকদের একটি বিরাট দল সৃষ্টি করেন। অতঃপর তাঁর চারপুত্র বিশেষ করে শাহ্ আবদুল আজীজ (রঃ) বিপুলভাবে এ দলটির কলেবর বৃদ্ধি করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন এলাকায় হাজার হাজার ব্যক্তি ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা ছিলেন শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র চিন্তার ধারক। তাঁদের হৃদয়পটে ইসলামের নির্ভুল চিত্র অঙ্কিত ছিল। তারা নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও উন্নত চরিত্রের কারণে সাধারণ লোকদের মধ্যে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ও তাঁর শাগরিদগণের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে পরিণত হন। এ জিনিসটি পরোক্ষভাবে সেই আন্দোলনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে যেটি শাহ্ সাহেবের পরিবার এবং তাঁর ভক্তগোষ্ঠীর মধ্য থেকে জন্ম লাভ করার প্রতীক্ষায় ছিল।

সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী ১৭৮৬ খ্রীঃ (১২০১ হিজরী) জন্মগ্রহণ করেন। শাহ্ ইসমাইল শহীদ ১৭৭৯ খ্রীঃ (১১৯৩ হিঃ) জন্মগ্রহণ

করেন। উভয়ই ১৮১৩ খ্রীঃ (১২৪৬হিঃ) বালাকোটের প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করেন। সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী (রঃ) ও শাহ্ ইসমাঈল (র.) উভয়ই আত্মিক ও চিন্তাগত দিক থেকে একই অস্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। আর এই একক অস্তিত্বকে আমি স্বতন্ত্র মুজাদ্দিদ মনে করি না, বরং শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্‌র তাজদীদের পরিশিষ্ট মনে করি। তাঁদের কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত সার হলো ঃ (১) তাঁরা সাধারণ মানুষের ধর্ম, চরিত্র, আচার-ব্যবহার ও লেনদেনের সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যে সব স্থানে তাদের প্রভাব পৌঁছায়, সেখানকার জীবন ধারায় এমন বিপুল বিপ্লব সাধিত হয় যে, মানুষের চোখে সাহাবাদের (রাঃ) জামানার চিত্র ভেসে উঠে। (২) ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ভারতের মত একটি পতনোম্মুখ দেশে তাঁরা যেভাবে ব্যাপক হারে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং এ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে যেভাবে নিজেদের সাংগঠনিক যোগ্যতার পূর্ণতা প্রকাশ করেন তা এক প্রকার অসম্ভব ছিল। অতঃপর একান্ত দূরদর্শীতার সাথে তাঁরা কার্যারম্ভের জন্য উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলকে নির্বাচিত করেন। বলাবাহুল্য, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে এটিই ছিল কাজের উপযোগী স্থান। অতঃপর এই জিহাদে তাঁরা এমন চরিত্রনীতি ও যুদ্ধ-আইন ব্যবহার করেন যে, তার মাধ্যমে একজন দুনিয়াদার স্বার্থবাদী যোদ্ধার মোকাবিলায় একজন খোদার পথে জিহাদকারীর বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। এভাবে তাঁরা দুনিয়ার সামনে আর একবার সঠিক ইসলামী আদর্শ ও ধ্যান ধারণার বিকাশ ঘটান। তাঁদের যুদ্ধ দেশ-জাতি বা দুনিয়ার স্বার্থকেন্দ্রীক ছিল না, বরং একান্তভাবে খোদার পথে ছিল। খোদার সৃষ্টিকে জাহিলিয়াতের শাসনমুক্ত করে তাদের উপর স্রষ্টা ও

বিশ্ব জাহানের মালিকের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া তাঁদের দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এ উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে নিয়মানুযায়ী প্রথমে তাঁরা ইসলাম অথবা জিজিয়ার দিকে আহবান করেন। অতঃপর নিজেদের পক্ষ থেকে পূর্ণরূপে নিশ্চিত হবার পর তাঁরা অস্ত্র ধারণ করতেন আর অস্ত্র ধারণ করার পর ইসলামের মার্জিত ও উন্নত যুদ্ধ আইনের পুরোপুরি আনুগত্য করতেন। কোন নির্যাতনমূলক ও হিংসাত্মক কার্য তাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়নি। তাঁরা যে লোকালয়ে প্রবেশ করেছেন, সংস্কারক হিসেবেই করেছেন। তাঁদের সেনাদলের সাথে শরাব থাকতো না, ব্যান্ড বাজতোনা, তাঁদের সাথে থাকতো না পতিতাদের পল্টন, তাদের সেনানিবাস ব্যাভিচারিদের আড্ডাখানায় পরিণত হতো না এবং এমন কোন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়নি যে, তাঁদের সেনাদল কোন স্থান অতিক্রম করেছে আর সেখানকার মহিলারা তাদের সতীত্ব হারিয়ে মাতম করতে বসেছে। তাদের সিপাহীরা দিনের বেলায় ঘোড়ার পিঠে আর রাতে জায়নামাজের উপর থাকতেন। তাঁরা খোদার ভয়ে ভীত থাকতেন, আখেরাতের হিসাব ও জওয়াবদিহিকে হামেশা সামনে রাখতেন। এ ব্যাপারে তাঁরা কোন প্রকার লাভ-ক্ষতির পরওয়া করতেন না। তাঁরা কোথাও পরাজিত হলে কাপুরুষ প্রমাণিত হননি। আবার কোথাও বিজয় লাভ করলে নিষ্ঠুর ও অহংকারী প্রমাণিত হননি। তাঁদের আগে ও পরে এ অঞ্চলে এ ধরণের নির্ভেজাল ইসলামী জিহাদ আর অনুষ্ঠিত হয়নি। (৩) তাঁরা একটি ক্ষুদ্রতম এলাকায় স্বল্পকালীন ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ লাভ করেন। এ সময় তাঁরা যথার্থ খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়্যাত (নবুয়তের পন্থানুসারে খিলাফত) এর পদ্ধতিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। ফকীরী শাসন, সাম্য, পরামর্শ সভা,

ন্যায় বিচার, ইনসাফ, শরীয়তের আইন, হক অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করা এবং হক অনুযায়ী খরচ করা, দুর্বল হলেও মজলুমের সাহায্য করা, শক্তিশালী হলেও জালিমের বিরোধিতা করা, খোদাভীরুতার সাথে দেশ শাসন করা এবং সততার সাথে রাজনীতি পরিচালনা করা ইত্যাদি সকল দিক দিয়েই তাঁরা সেই ইসলামী খিলাফতের পূর্ণাঙ্গ নমুনা পেশ করেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর আমলের খিলাফতের চিত্রকে তাঁরা পুনরুজ্জীবিত করেন।

খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালানোই মুমিনের সত্যিকারের সাফল্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী, শাহ্ ইসমাঈল শহীদ ও তাঁদের অনুসারীগণ অবশ্যই সফলকাম হয়েছিলেন। তবে পার্থিব ফলাফলের দিক দিয়ে তাঁদের ব্যর্থতা পরিস্ফুট। কার্যতঃ তাঁরা জাহেলিয়াতের কর্তৃত্ব নির্মূল করে ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। আমরা এরই কারণসমূহ পর্যালোচনা করবো। যাতে করে পরবর্তীকালে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ঐ কারণসমূহের ব্যাপারে সতর্ক থাকা সম্ভব হয়। কতিপয় জাগতিক কারণে তাঁরা ব্যর্থ হন। এ কারণগুলো আমি পরে বর্ণনা করছি। কিন্তু চিন্তার জগতে তাঁরা যে আলোড়ন সৃষ্টি করে যান, তার প্রভাব এক শতাব্দীর অধিক সময় অতিক্রান্ত হবার পর আজও উপমহাদেশে পরিদৃষ্ট হচেছ।

ব্যর্থতার কারণ

এই সর্বশেষ সংস্কারমূলক আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণসমূহ পর্যালোচনা করা সাধারণতঃ তাঁদের রুচি বিরুদ্ধ, যাঁরা নিছক ভক্তি সহকারেই মহামনীষীদের কথা আলোচনা করার পক্ষপাতী। এজন্য আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, উপরোক্ত শিরোনামে আমি যা কিছু পেশ করবো, তা আমার অনেক ভাইয়ের মনোবেদনার কারণ হবে। কিন্তু পূর্ববর্তী মনীষীগণের উদ্দেশ্যে নিছক প্রশংসাবাণী বিতরণ করাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে বরং আগামীতে দ্বীনের সংস্কারের কাজে তাঁদের কার্যাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তাহলে সমালোচকের দৃষ্টিতে ইতিহাস পর্যালোচনা করা এবং এই মনীষীদের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করার সাথে সাথে উদ্দেশ্য সাধনে তাঁদের ব্যর্থতার কারণসমূহ অনুসন্ধান করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ (রঃ) এবং তাঁর পুত্রগণ হকপরস্ত আলেম ও সৎলোকদের যে মহান দল সৃষ্টি করেন, অতঃপর সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী (রঃ) ও শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রঃ) সৎ ও খোদাভীরু লোকদের যে বাহিনী গঠন করেন, তার বিবরণ পড়ে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই, মনে হয় বুঝি আমরা ইসলামের প্রথম যুগের সাহাবা ও তাবেঈনের জীবন চরিত্র পাঠ করছি। আমরা অবাক হয়ে ভাবি যে, আমাদের এতো নিকটতম যুগে এমন অদ্ভুত উন্নত চরিত্রের লোকের আগমন হয়েছিল। কিন্তু এই সঙ্গে আমাদের মনে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে যে, এতো বড় সংস্কার ও বিপ্লবী আন্দোলন, যার নেতৃবৃন্দ ও কর্মীগণ এমন সৎ, খোদাভীরু ও অক্লান্ত মুজাহিদ ছিলেন, তাঁরা চরম প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও

উপমহাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হননি কেন? অথচ এর বিপরীত পক্ষে সাত সমুদ্র তের নদীর পাড় থেকে আগত ইংরেজরা এখানে নির্ভেজাল জাহেলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। ভক্তির উচছ্বাসে অন্ধ হয়ে এ প্রশ্নটির জবাব দানে বিরত থাকার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, লোকেরা সত্য, সততা, খোদাভীরুতা ও জিহাদকে খোদার দুনিয়া সংশোধনের ক্ষেত্রে দুর্বল প্রভাবের অধিকারী মনে করতে থাকবে। এ চিন্তা তাদেরকে নিরাশ করবে যে এতো বড় সৎ ও খোদাভীরু লোকদের প্রচেষ্টায় যখন কিছু হলোনা তখন ভবিষ্যতেও আর কিছু হবে না। এ ধরণের সন্দেহ আমি লোকদের মুখে শুনেছি, বরং হালে আমি যখন আলীগড়ে যাই, তখন ষ্ট্রেচী হলের বিরাট সমাবেশে আমার সম্মুখে এই সন্দেহই পেশ করা হয়। এ সন্দেহ অপনোদন করার জন্য আমাকে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিতে হয়। উপরন্তু আমি এও জানি যে, অধুনা উলামা ও সৎ লোকদের যে বিরাট দল আমাদের মধ্যে আছেন, তাঁদেরও বেশীরভাগ এ ব্যাপারে একেবারেই চিন্তাশূন্য। অথচ এ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো হলে এমন সব শিক্ষা আমরা লাভ করতে পারি যার আলোকে আগামীতে আরো বেহ্তের ও অধিকতর নির্ভুল কার্য সম্পাদিত হতে পারে।

প্রথম কারণ

হযরত মুজাদ্দিদে আলফিসানির যুগ থেকে নিয়ে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী ও তাঁর প্রতিনিধিবৃন্দের সময় পর্যন্ত যাবতীয় সংস্কারমূলক কাজে যে জিনিসটি প্রথম আমার চোখে বাধে, তা হলো এই যে, তাঁরা তাসাউফের ব্যাপারে মুসলমানদের রোগ পুরোপুরি অনুধাবন করতে

পারেননি এবং অজানিতভাবে তাদেরকে পুণর্বার সেই খাদ্যই দান করেন যা থেকে তাদেরকে পূর্ণরূপে দূরে রাখার প্রয়োজন ছিল। তারা যে তাসাউফ পেশ করেন তার মূল কাঠামোর বিরুদ্ধে আমার কোন আপত্তি নেই, বরং প্রাণবস্তুর দিক দিয়ে তা ইসলামের আসল তাসাউফ। এ তাসাউফ "এহসান" থেকে মোটেই ভিন্নতর নয়। কিন্তু যে বস্তুটিকে আমি পরিত্যাজ্য বলছি, তাহলো তাসাউফের রূপক, উপমা ও তার ব্যবহার এবং তাসাউফের সাথে সামঞ্জস্যশীল পদ্ধতি জারী রাখা। বলা বাহুল্য সত্যিকার ইসলামী তাসাউফ এ বিশেষ খোলসের মুখাপেক্ষী নয়। এরজন্য ছাঁচও আছে। এরজন্য অন্য প্রকার ভাষাও ব্যবহার করা যেতে পারে। উপমা ও রূপক থেকেও অব্যাহতি লাভ করা যেতে পারে। পীর-মুরিদী এবং এ ব্যাপারে যাবতীয় বাস্তব আকৃতি পরিহার করে অন্য আকৃতি গ্রহণ করা যেতে পারে। তাহলে সেই পুরানো ছাঁচ -যার মধ্যে দীর্ঘকাল থেকে জাহেলী তাসাউফের আধিপত্য চলে আসছিল- তাকে গ্রহণ করার জন্য চাপ দেয়ার কিইবা প্রয়োজন ছিল। এর ব্যাপক ও বিপুল প্রচার মুসলমানদের মধ্যে যে সব কঠিন নৈতিক ও আকিদাগত রোগের সৃষ্টি করেছে, তা বিচক্ষণ ব্যক্তির দৃষ্টির অগোচরে নেই। বর্তমান পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কোন ব্যক্তি যতই নির্ভুল শিক্ষাদান করুক না কেন এই ছাঁচ ব্যবহার করার সাথে সাথেই শত শত বছরের প্রচলনের ফলে এর সাথে যেসব রোগ সংশ্লিষ্ট হয়েছে সেগুলির পুনরাবির্ভাব ঘটে। কাজেই পানির মত হালাল বস্তুও যেমনিভাবে ক্ষতিকর প্রমাণিত হলে রোগীর জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, অনুরূপভাবে এ ছাঁচ বৈধ হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র একারণেই পরিত্যাজ্য যে, এরই আবরণে মুসলমানদের মধ্যে আফিমের নেশা সৃষ্টি করা হয়েছে। এর নিকটবর্তী হতেই পুরাতন রোগীদের মানসপটে

আবার সেই ঘুমপাড়ানীর কথা ভেসে উঠে, যার মাধ্যমে শত শত বছর থেকে গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তাদেরকে নিদ্রাবিভূত করেছে। পীরের হাতে বাইয়াত হবার পর মুরীদের মধ্যে সেই বিশেষ মানসিকতা সৃষ্টি হয় -যা একমাত্র পীর-মুরীদের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ "পীরের কথায় সিরাজীর রঙে রঙীন হও"- এ ধরণের মানসিকতায় যার পর পীর সাহেব ও গায়রুল্লাহ্‌র মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। তাদের চিন্তা ও দৃষ্টি শক্তি স্থবিরত্বে পৌঁছে যায় এবং পর্যালোচনা ও সমালোচনা শক্তি নিস্ক্রীয় হয়ে যায়। বুদ্ধি-জ্ঞানের ব্যবহার স্থগিত হয়, এবং মন-মস্তিস্কের উপর শায়খের বন্দেগীর এমন পরিপূর্ণ আধিপত্য বিস্তার লাভ করে যার ফলে শায়খ যেন তাদের প্রতিপালক এবং তারা শায়খের প্রতিপালিত হিসেবে পরিগণিত হয়। অতঃপর কাশফ ও ইলহামের আলোচনা শুরু হবার সাথে সাথে মানসিক দাসত্বের বাঁধন আরও বেশী শক্তিশালী হতে থাকে। তারপর শুরু হয় সূফিদের রূপক ও উপমার প্লাবন। এর ফলে মুরীদদের কল্পণাশক্তি যেন চাবুক খাওয়া অশ্বের ন্যায় তাদেরকে নিয়ে তীর বেগে ছুটতে থাকে। এ অবস্থায় তারা প্রতি মুহূর্তে অদ্ভুত তেলেসমাতির দুনিয়ায় সফর করতে থাকে, বাস্তবের দুনিয়ায় অবস্থান করার সুযোগ তারা খুব কমই লাভ করে।

মুসলমানদের এ রোগ সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ) ও হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ অনবগত ছিলেন না। উভয়ের রচনায় এর সমালোচনা করা হয়েছে। সম্ভবতঃ এ রোগের ব্যাপকতা সম্পর্কে তাঁদের পূর্ণ ধারণা ছিল না। এ কারণেই তাঁরা এই রোগীদেরকে পূনর্বার এমন পথ্য দান করেন যা এই রোগে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছিল। ফলে তাঁদের উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ধীরে ধীরে

আবার সেই পুরাতন রোগে আক্রান্ত হতে থাকে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ)-এর ইন্তেকালের কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সমর্থকগণ তাঁকে "কাইউমে আউয়াল" ও তাঁর খলিফাদেরকে "কাইউমে সানী" উপাধী দান করেন। অথচ কাইউম খোদার একটি সিফাত। যদিও মাওলানা শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রঃ) এ সত্য যথার্থরূপে উপলব্ধি করে ঈমাম ইবনে তাইমিয়ার (রঃ) নীতি অনুসরণ করেন কিন্তু শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর (রঃ) রচনাবলীতেই এর যথেষ্ট মাল-মসলা ছিল এবং শাহ্ ইসমাইলের (রঃ) রচনাবলীও তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কাজেই ব্রেলভীর আন্দোলনেও পীর-মুরীদীর সিলসিলা চালু হয়ে গিয়েছিল। তাই সুফীবাদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে এ আন্দোলনও মুক্ত হতে পারেনি। এমনকি সাইয়েদ আহমদের শাহাদত লাভের পরই তাঁর সমর্থকদের মধ্যে এমন একটি দলের উদ্ভব হয়, যারা শিয়াদের ন্যায় তাঁর অদৃশ্য হবার কথা বিশ্বাস করেন এবং আজ ও তাঁর পুনরাবির্ভাবের প্রতীক্ষায় আছেন। বর্তমানে যিনি তাজদীদে দ্বীনের কাজ করতে চাইবেন, তাঁকে অবশ্যই সুফীবাদের ভাষা-পরিভাষা, ব্যাপক উপমা, পীর-মুরীদি এবং তাদের পদ্ধতি স্মরণ করিয়ে দেয় এমন প্রতিটি জিনিষ থেকে মুসলমানদেরকে দূরে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে বহুমূত্র রোগীকে যেমন চিনি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়, মুসলমানদেরকে অনুরূপভাবেই উল্লেখিত বিষয়গুলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

দ্বিতীয় কারণ

এ আন্দোলনকে সমালোচনার দৃষ্টিতে অধ্যায়ন করার সময় দ্বিতীয় যে জিনিসটি আমি অনুভব করেছি, তা হলো এই যে, সাইয়েদ আহমদ ও শাহ্ ইসমাঈল শহীদ যে এলাকায় অবস্থান করে জিহাদ পরিচালনা করেন এবং যে ইসলামী হুকুমত কায়েম করেন, সে এলাকাটিকে পূর্ব থেকেই এ বিপ্লবের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত করেননি। তাঁদের সেনাবাহিনী অবশ্যই উন্নত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে একত্রিত হয়েছিলেন। উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে তাঁরা ছিলেন মোহাজিরের পর্যায়ভুক্ত। এই এলাকায় রাজনৈতিক বিপ্লব অনুষ্ঠানের জন্য প্রথমে স্থানীয় লোকদের মধ্যে নৈতিক ও মানসিক বিপ্লব অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল। এর ফলে স্থানীয় লোকেরা ইসলামী রাষ্ট্রকে বুঝবার এবং তার সাহায্যকারী আনসার হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারতো। উভয় নেতৃবৃন্দই সম্ভবতঃ এই বিভ্রান্তির শিকার হন যে, সীমান্তের লোকেরা যেহেতু মুসলমান এবং অমুসলিম শাসকদের দ্বারা নির্যাতিত কাজেই তারা ইসলামী শাসনকে স্বাগত জানাবে। এ কারণেই তাঁরা সেখানে পৌঁছে জিহাদ শুরু করেছেন এবং কতগুলো এলাকা তাদের কর্তৃত্বাধীনে আসে, তার সবগুলোতেই খিলাফত কায়েম করেন। কিন্তু অবশেষে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ হয়ে যায় যে, নামের মুসলমানকে সত্যিকার মুসলমান মনে করা এবং সত্যিকার মুসলমানের দ্বারা যে কাজ সম্ভব, নামের মুসলমানদের নিকট থেকে সে কাজের আশা করা নিছক প্রতারণা ছিল। যারা খেলাফতের বোঝা বহন করার শক্তি রাখতো না, তাদের ওপর এ বোঝা রাখার ফলে নিজেরাতো ভূপাতিত

হয়েছেই, সাথে সাথে এই ইমারতটিকেও ভূপাতিত করে ছেড়েছে। আগামীতে প্রতিটি সংস্কারমূলক কাজে ইতিহাসের এ শিক্ষাকে সম্মুখে রাখা প্রয়োজন। এ সত্যটি পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করা উচিৎ যে, যে রাজনৈতিক বিপ্লবের শিকড় সামগ্রিক চিন্তা, চরিত্র ও তমাদ্দুনের মধ্যে আমুল বিদ্ধ না থাকে তা কোন দিন সার্থক হতে পারে না। কোন সাময়িক শক্তির মাধ্যমে এমন বিপ্লব কোথাও সংঘটিত হয়ে গেলে স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। আর তা বিলুপ্ত হবার সময় পিছনে কোন চিহ্নই রেখে যায় না। এ কারণেই বর্তমানে সীমান্ত প্রদেশে হযরত সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী ও শাহ্ ইসমাঈল শহীদের কোন প্রভাব অনেক অনুসন্ধান করেও পাওয়া যায় না। এমন কি সেখানকার লোকেরা বর্তমানে বিভিন্ন উর্দূ বই-পত্রের মাধ্যমে তাঁদের নাম জানতে পারছে।

তৃতীয় কারণ

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, এই বুজুর্গগণের তুলনায় কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে আগত ইংরেজদের এমন কি শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, যার ফলে তারা এখানে জাহেলী রাষ্ট্র কায়েম করতে সক্ষম হয়? অথচ এঁরা নিজেদেরই দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে পারলেন না কেন? আঠার ও উনিশ ঈসায়ী শতকের ইউরোপের ইতিহাস সম্মুখে না থাকলে এর নির্ভুল জবাব পাওয়া যাবে না। সৈয়দ আহমদ (রঃ) শাহ্ ইসমাঈল (রঃ) ও তাঁদের অনুগামীগণ ইসলাম সংস্কারের জন্য যে কার্য সম্পাদন করেন, তাঁর সমস্ত শক্তিকে তুলাদন্ডের একদিকে এবং অন্যদিক সমকালীন জাহেলিয়াতের শক্তিকে স্থাপন করলে তবেই

পূর্ণরূপে অনুমান করা সম্ভব হবে যে, এই বস্তুজগতে যে নীতি-নিয়ম কার্যকরী রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই দুই শক্তির আনুপাতিক হার কি ছিল? এ কথা মোটেই অতিশয়োক্তি হবে না যদি আমি বলি যে, এ দু'টির মধ্যে এক তোলা ও এক মণের সম্পর্ক ছিল। এ জন্যে বাস্তবে যে ফলাফল সূচিত হয়েছে তা থেকে ভিন্নতর কিছু হওয়া সম্ভবপর ছিল না। যে যুগে আমাদের দেশে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ, শাহ্ আবদুল আজিজ, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী, শাহ্ ইসমাঈল শহীদ জন্মগ্রহণ করেন, সে যুগেই ইউরোপ নব শক্তির নবউদ্দীপনা নিয়ে মধ্য যুগের নিদ্রা থেকে জেগে উঠেছিল। সেখানে জ্ঞান ও শিল্প অনুসন্ধানকারী উদ্ভাবক ও আবিস্কারক এত বিপুল সংখ্যায় জন্ম লাভ করেছিলেন যে, তারা সবাইমিলে এই দুনিয়ার চেহারাই পাল্টিয়ে দেন। এই যুগেই হিউম, কান্ট, ফিশতে (FICHTE), হেগেল, কোঁতে (COMET) শিলার মাশার (SCHLIER MACHER) ও মিল-এর ন্যায় দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা তর্ক শাস্ত্র, দর্শন, মনস্তত্ব, এবং যুক্তিবিদ্যার সমগ্র শাখা প্রশাখায় বিপ্লব সাধন করেন। এ যুগেই শরীরবিদ্যায় গ্যালভানী (GALVANI) ও ভল্টা (VOLTA) রসায়ন শাস্ত্রে ল্যাভয়সিয়র (LAVOIIER), প্রিস্টলি (PRIESTLEY) ডেভী (DEVY), বার্জিলয়িস (BERZII-IVS) এবং জীব বিদ্যায় লিনে (LINNE), হলার (HALLER), বিশাত (BICHAT) ও উলফ (WOLF) এর ন্যায় পন্ডিতদের আর্বিভাব হয়। তাঁদের গবেষণা শুধু বিজ্ঞানে উন্নতির সহায়কই হয়নি বরং বিশ্ব জাহানের মানুষ সম্পর্কে একটি নয়া মতবাদেরও জন্ম দেয়। এ যুগেই কুইসনে (QUISNEY), টার্গট (TUROIOT), এড্যাম স্মিথ (ADAMSMITH) ও ম্যালথাসের গবেষণার মাধ্যমে নয়া অর্থনীতি বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। এ

যুগেই ফ্রান্সে রুশো, ভলটেয়ার, মান্সস্কো, ডেনিস ডাইডর্ট (DENIS DIDEROT), লা-ম্যাটরি (LA-MATTRIE), ক্যাবানিস (CABANIS), বাফন (BAFFON) ও রোবিনেট (ROBINET), ইংল্যান্ডে টমাসপোন (TOMASPOUNE), উইলিয়াম গডউইন (WILLIAM GODWIN), ডেভিট হার্টলে (DAVID HARTLEY), জোসেফ প্রিস্টলে (JOSEPH PRESTLY), ও এরাসমাস ডারউইন এবং জার্মানীতে গেটে, হার্ডার শিলার (SCHILER), উইঙ্কেলম্যান (WINEKELMANN), লিসিং (LISSING) হোলবাস (HOLBACH) এবং আরো অনেক গবেষকের জন্ম হয়। তাঁরা নৈতিক দর্শন, সাহিত্য, আইন, ধর্ম, রাজনীতিবিদ্যার সকল শাখায় বিপুল প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁরা নির্ভীকভাবে প্রাচীন মতবাদ ও চিন্তা ধারার কঠোর সমালোচনা করে চিন্তার এক নতুন দুনিয়া সৃষ্টি করেন। প্রেসের ব্যবহার, প্রচারের আধিক্য, আধুনিক প্রকাশভঙ্গী ও কঠিন পরিভাষার পরিবর্তে সাধারণের বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করার কারণে তাঁদের চিন্তার ব্যাপক প্রচার হয়। তাঁরা মাত্র গুটিকয়েক ব্যক্তিকে নয় বরং বিভিন্ন জাতিকে সামগ্রিক ভাবে প্রভাবিত করেন। পুরাতন মানসিকতা, নৈতিকবৃত্তি ও রীতি-প্রকৃতি, শিক্ষাব্যবস্থা, জীবনাদর্শ ও জীবনব্যবস্থা এবং তমদ্দুন ও রাজনীতির সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যে তাঁরা আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। এ যুগেই ফরাসী বিপ্লব সাধিত হয়। এ থেকে একটি নতুন সভ্যতার জন্ম হয়। এ যুগেই যন্ত্রের আবিস্কারের ফলে শিল্পক্ষেত্রে বিপ্লব সাধিত হয়। যার ফলে একটি নতুন তমদ্দুন, নতুন শক্তি, নয়া জীবন সমস্যার উদ্ভব হয়। এ যুগেই ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প অসাধারণ উন্নতি লাভ করে। এর ফলে ইউরোপ এমন সব সশক্তির অধিকারী হয়, যা ইতোপূর্বে আর কোন জাতির

ছিলনা। এ যুগেই পুরাতন যুদ্ধনীতির স্থলে নয়ানীতি, নয়া যুদ্ধাস্থ্ ও যুদ্ধপদ্ধতির প্রচার হয়। দস্তুরমত ড্রিলের মাধ্যমে সৈন্যদেরকে সংগঠিত করার পদ্ধতি গৃহীত হয়। এর ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাদল মেশিনের ন্যায় আন্দোলিত হতো এবং পুরাতন পদ্ধতিতে শিক্ষিত সেনাদল তাদের মোকাবিলায় টিকতে পারতো না। সৈন্যদের ট্রেনিং, সেনাদল বিভাগ ও যুদ্ধ কৌশলের মধ্যে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয় এবং প্রতিটি যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে এ শিল্পটাকে অনবরত উন্নত করার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। অনবরত আবিস্কারের মাধ্যমে যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। রাইফেল আবিস্কার হয়। হাল্কা ও দ্রুত বহনকারী মেশিনগান তৈরী করা হয়। কেল্লা ধ্বংসকারী মেশিনগান পূর্বের চাইতে শক্তিশালী করে তৈরী করা হয় এবং সর্বোপরি কার্তুজের আবিস্কার, বন্দুকের মোকাবিলায় পুরানো পাউডার বন্দুককে একেবারেই অকেজো প্রমাণ করে। এ কারণেই ইউরোপে তুর্কীদেরকে এবং উপমহাদেশে দেশীয় রাষ্ট্রগুলোকে আধুনিক পদ্ধতিতে সুশিক্ষিত ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর মোকাবিলায় অনবরত পরাজয় বরণ করতে হয় এবং মুসলিম জাহানের কেন্দ্রস্থলে হামলা করে নেপেলিয়ান মুষ্টিমেয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে মিশর দখল করে নেয়।

সমকালীন ইতিহাসের পাতায় মোটামুটি একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এ কথা সহজেই পরিষ্ফুট হবে যে, আমাদের এখানে কতিপয় ব্যক্তি জাগ্রত হন। এখানে জীবনের মাত্র একটি দিকে সামান্য কাজ হয়। কিন্তু সেখানে জীবনের প্রতিটি দিকে হাজার গুণ বেশী কার্য সম্পাদিত হয়। বরং জীবনের এমন কোন দিক ছিল না যেখানে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এখানে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ ও তাঁর পুত্রগণ এবং

তাঁর শিষ্যগণ বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রে কতিপয় কিতাব লিখেন। তাঁদের এ চিন্তাগুলো অত্যন্ত সীমিত পরিবেশে পৌঁছেই আটকে থাকে। আর সেখানে প্রতিটি বিদ্যা-শিল্পের উপর বই লিখে লাইব্রেরীর পর লাইব্রেরী ভর্তি করা হয়। তাদের চিন্তাসমূহ সমগ্র দুনিয়ায় পরিব্যাপ্ত হয়। অবশেষে মানুষের মন-মগজের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এখানে দর্শন, নৈতিক চরিত্রনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রের ভিত্তিতে নয়া বুনিয়াদ স্থাপনের আলোচনা নেহায়েত প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে। পরবর্তীকালে তার ওপর আর কোন কাজ হয়নি। আর সেখানে ইত্যবসরে এইসব সমস্যার ওপর পূর্ণাঙ্গ চিন্তাধারা গড়ে ওঠে। এই চিন্তাধারা সমগ্র বিশ্বের চিত্র পরিবর্তিত করে। এখানে শরীরবিদ্যা ও বস্তু-শক্তি সম্পর্কিত বিদ্যা পাঁচশ বছর আগের ন্যায় একই পর্যায়ে অবস্থান করে। আর সেখানে এই ক্ষেত্রে এতবেশী উন্নতি সাধিত হয় এবং সেই উন্নতির কারণে পাশ্চত্যবাসীদের শক্তি এত বেশী বেড়ে যায় যে, তাদের মোকাবিলায় পুরাতন যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণের জোরে সাফল্য লাভ করা একেবারেই অসম্ভব ছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই যে, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র যুগে ইংরেজরা বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করেছিল এবং এলাহ্বাদ পর্যন্ত তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু শাহ্ সাহেব এই নয়া উদীয়মান শক্তিটির ব্যাপারে কোন খোঁজখবর নেননি। শাহ্ আবদুল আজিজের যুগে দিল্লীর ইংরেজদের নিকট থেকে পেনশান লাভ করতো আর প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের ওপর ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মনে কখনো এ প্রশ্ন জাগেনি যে, এ জাতিটি কেমন করে এত অগ্রসর হচেছ এবং এই নয়া শক্তির পেছনে কোন্ শক্তি কার্যকরী আছে? সাইয়েদ সাহেব ও শাহ্ ইসমাঈল

শহীদ কার্যতঃ ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি করার জন্য কর্ম ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁরা যাবতীয় ব্যবস্থা ও আয়োজন সম্পন্ন করেন। কিন্তু জ্ঞানী ও বিচক্ষণ আলেমদের একটি দলকে ইউরোপে প্রেরণ করতে পারেননি- যারা গিয়ে অনুসন্ধান চালাতেন যে, কোন্ শক্তির জোরে এ জাতিটি তুফানের বেগে অগ্রসর হচেছ এবং নয়া যুদ্ধাস্ত্র, নয়া উপকরণ, নয়া পদ্ধতি ও নয়া জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে অভিনব শক্তি ও উন্নতি লাভ করছে? এর কারণ কি? তারা নিজেদের দেশে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছে? তারা কোন ধরণের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী? তাদের তমদ্দুন কিসের ভিত্তিতে গড়ে উঠছে? এবং তার মোকাবিলায় আমাদের নিকট কোন জিনিষের অভাব আছে? যখন তাঁরা জিহাদের অবতীর্ণ হন, তখন একথা কারুর অবিদিত ছিল না যে, উপমহাদেশে শিখদের নয় ইংরেজদের শক্তি হলো আসল শক্তি, আর ইংরেজদের বিরোধিতাই ইসলামী বিপ্লবের পথে সবচেয়ে বড় বিরোধিতা হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের সংঘর্ষের চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে প্রতিদ্বন্দ্বির মোকাবিলায় নিজেদের শক্তির পরিমাপ করা বরং নিজেদের দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে সবগুলো দূর করার প্রচেষ্টা চালানো উচিৎ ছিল। আমি বুঝতে পারিনা, এই বুজর্গদের দূরদর্শী দৃষ্টি থেকে পরিবেশের এ গুরুত্বপূর্ণ দিকটি প্রচছন্ন রইল কেমন করে? বলাবাহুল্য, এ ধরণের ভুলের ফলাফল থেকে তাঁরা নিষ্কৃতি পেতে পারেন না। আসুন, পাশ্চাত্য জাহেলিয়াতের মোকাবিলায় ইসলাম পুনরুজ্জীবনের এ আন্দোলনটি যে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয় তা থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি যে, ইসলাম পুনরুজ্জীবনের জন্য নিছক এলমকে পুনরুজ্জীবিত ও শরীয়তের প্রাণ শক্তিকে সঞ্জীবিত করাই

যথেষ্ট নয় বরং একটি ব্যাপক ও বিশ্বজনীন ইসলামী আন্দোলন প্রয়োজন। এ আন্দোলন সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা, শিল্প-বাণিজ্য তথা জীবনের সকল বিভাগে নিজের প্রভাব পরিব্যাপ্ত করবে এবং সকল সম্ভাব্য শক্তিকে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করবে।

সমাপ্ত

-ঃ গ্রন্থপঞ্জী ঃ-

১. ওয়াহাবী আন্দোলন- আবদুল মওদুদ

২. সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহঃ)

৩. দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্- ডাব্লিউ. ডাব্লিউ. হান্টার

৪. শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব নজদীর জীবনী

৫. ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

৬. মর্দে মুজাহিদ যুগে যুগে- বদরে আলম

৭. শহীদ হাসানুল বান্নার ডায়েরী- খলিল আহমদ হামিদী

ইসলামী আন্দোলনকে জানতে হলে পড়ুন
আমাদের প্রকাশিত বইগুলো

১. শহীদ হাসানুল বান্নার ডায়েরী- খলিল আহ্‌মদ হামিদী

২. মিশরের রাজনীতিতে ইখওয়ানুল মুসলেমিনের ভূমিকা- খলিল আহ্‌মদ হামিদী

৩. কারাগারে রাতদিন- জয়নব আল গাজ্জালী

৪. আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা- জুলফিকার আহ্‌মদ কিস্‌মতি

৫. ঈমানের অগ্নী পরীক্ষা- মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

৬. শাহাদত-ই জান্নাত লাভের সর্বোত্তম পথ- মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

৭. ইসলামী পুনর্জাগরণ সমস্যা ও সম্ভাবনা- ডঃ ইউসুফ আল কারজাভী

৮. ওমর ইবনে আবদুল আজীজ ও ইসলামী শাসনের বাস্তব চিত্র - রশীদ আখতার নদভী

৯. রক্ত পিচ্ছিল পথের যাত্রী যারা (১ ও ২)

১০. যে যুদ্ধের শেষ নেই
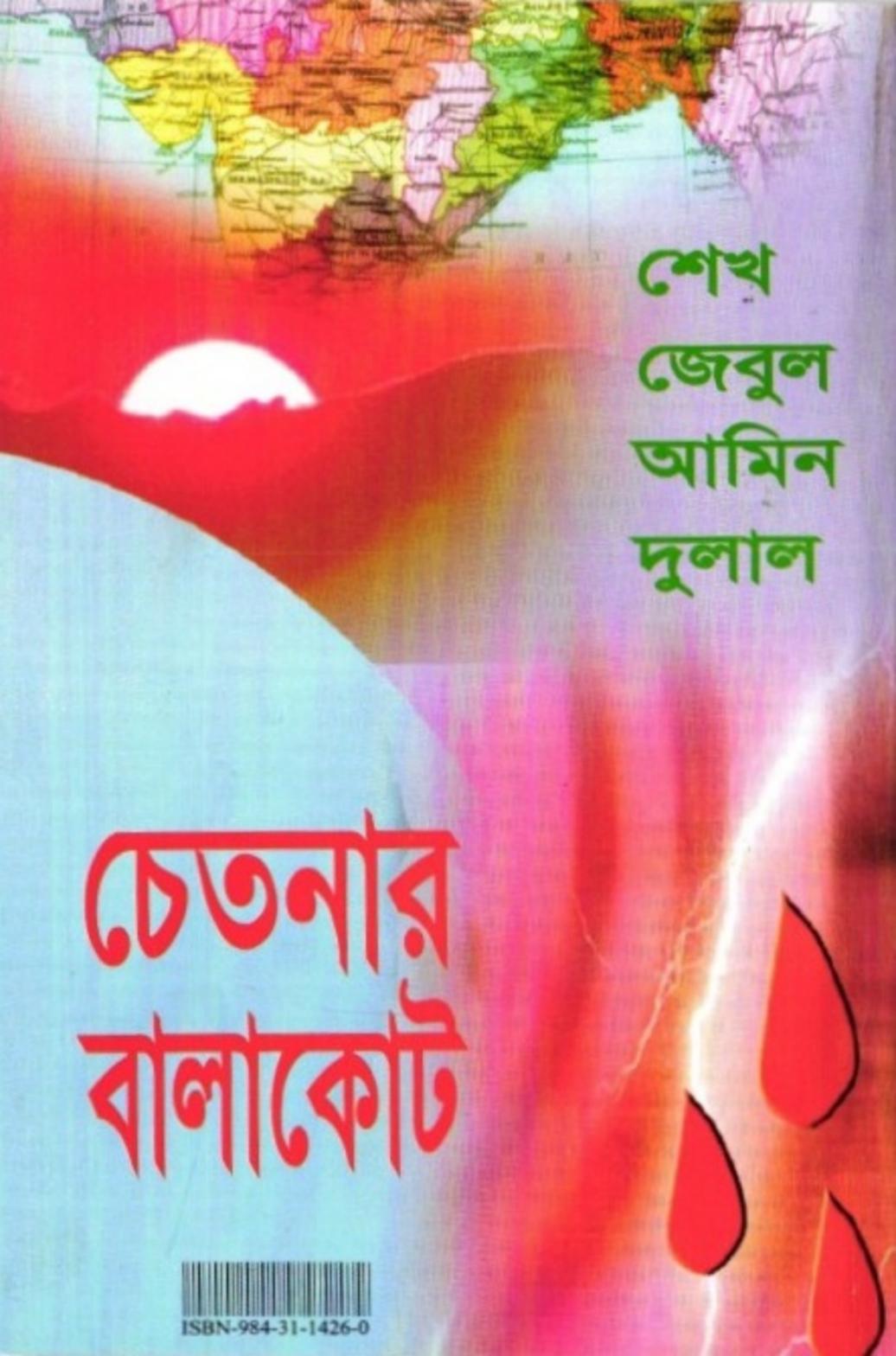
শেখ
জেবুল
আমিন
দুলাল
চেতনার
বালাকোট
ISBN-984-31-1426-0